মাসুদ রানা

নরকের ঠিকানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

নরকের ঠিকানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

কঠিন বিপদে পড়েছে কতিপয় আরব দেশ.
উপায় না পেয়ে বন্ধু রাহাত খানের সাহায্য চেয়েছে।
বাঁচার পথ দেখালেন তিনি, এবং তা কার্যকর করতে
যেতে হলো মাসুদ রানাকে।
আতাসীসহ পাঁচ কমান্ডো নিয়ে ইসরাইলে ঢুকল ও
বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে–একটা পাহাড়
ধ্বংস করতে হবে, নইলে আরব বিশ্বের নিস্তার নেই।
কিন্তু ও-দেশে ঢুকেই বিপদে পড়ে গেল মিশন,
ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে ইসরাইলী সীমান্ত
প্রহরীরা, হন্যে হয়ে খুঁজছে দলটাকে।
কি করে নিজেদের বাঁচাবে রানা?
কি হবে মিশনের?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ২৯৭

নরকের ঠিকানা

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ শামীম ফয়সাল

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)

facebook.com/groups/we.are.bookworms

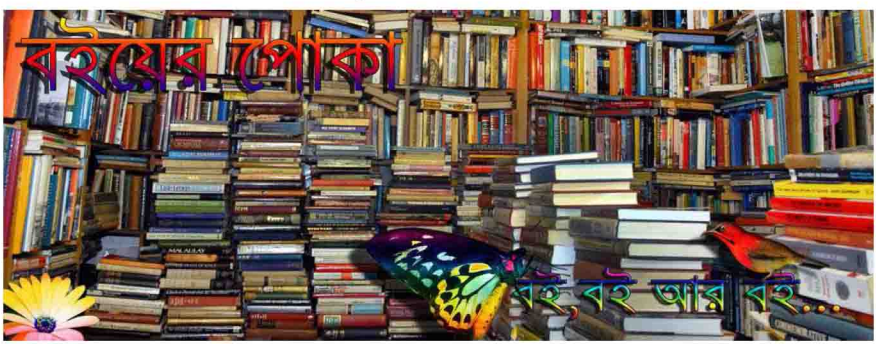

মাসুদ রানা ২৯৭

নরকের ঠিকানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7297-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
E-mail: sebapro@ssl-idt.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-297
NAROKER THIKANA
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

আটাশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়★ভারতনাট্যম ★স্বর্ণমৃগ ★দুঃসাহসিক★মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা★দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর★সাগরসঙ্গম★রানা! সাবধান!!★বিস্মরণ★রত্নদ্বীপ★নীল আতঙ্ক ★কায়রো মৃত্যুপ্রহর★গুপ্তচক্র★মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ★রাত্রি অন্ধকার★জাল★অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা ★ক্ষ্যাপা নর্তক★শয়তানের দূত ★এখনও ষড়যন্ত্র ★প্রমাণ কই? বিপদজনক★রক্তের রঙ★অদৃশ্য শত্রু★পিশাচ দ্বীপ★বিদেশী গুপ্তচর★ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা★ তিনশত্রু ★অকস্মাৎ সীমান্ত ★সতর্ক শয়তান★নীলছবি ★প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক★এসপিওনাজ★লাল পাহাড় ★হংকম্পন★প্রতিহিংসা★হংকং সম্রাট কুউউ★বিদায় রানা★প্রতিদ্বন্দ্বী★আক্রমণ★গ্রাস★স্বর্ণতরী★পপি★জিপসী★আমিই রানা সেই উ সেন★হ্যালো, সোহানা ★হাইজ্যাক ★ আই লাভ ইউ, ম্যান ★ সাগর কন্যা পালাবে কোথায়★টার্গেট নাইন★ বিষ নিঃশ্বাস★প্রেতাত্মা ★বন্দী গগল ★জিম্মি তুষার যাত্রা★স্বর্ণ সংকট★সন্ন্যাসিনী★পাশের কামরা★নিরাপদ কারাগার ★স্বর্ণরাজ্য উদ্ধার ★হামলা★ প্রতিশোধ★মেজর রাহাত★লেনিনগ্রাদ★অ্যামবুশ★আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর★নকল রানা★রিপোর্টার★মরুযাত্রা★বন্ধু★সংকেত★স্পর্ধা★চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ★চারিদিকে শত্রু★অগ্নিপুরুষ★অন্ধকারে চিতা★মরণ কামড়★মরণ খেলা অপহরণ★আবার সেই দুঃস্বপ্ন★বিপর্যয়★শান্তিদূত★শ্বেত সন্ত্রাস★ছদ্মবেশী★কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন ★সময়সীমা মধ্যরাত★আবার উ সেন ★বুমেরাং★কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ★কুচক্র★চাই সাম্রাজ্য★অনুপ্রবেশ★যাত্রা অশুভ★জুয়াড়ী★কালো টাকা কোকেন সম্রাট ★বিষকন্যা ★সত্যবাবা ★যাত্রীরা হুঁশিয়ার ★অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯★অশান্ত সাগর★শ্বাপদ সংকুল★দংশন★প্রলয় সঙ্কেত★ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ ★ডাবল এজেন্ট★আমি সোহানা ★অগ্নিশপথ ★জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান★গুপ্তঘাতক ★নরপিশাচ ★শত্রুবিভীষণ★অন্ধ শিকারী ★দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ★কালো ছায়া★নকল বিজ্ঞানী★বড় ক্ষুধা★স্বর্ণদ্বীপ★রক্তপিপাসা ★অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন★নীল দংশন★ সাউদিয়া ১০৩★কালপুরুষ★নীল বজ্র★মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট★অমানিশা★সবাই চলে গেছে★অনন্ত যাত্রা ★রক্তচোষা ★কালো ফাইল মাফিয়া★হীরকসম্রাট★সাত রাজার ধন★শেষ চাল★বিগব্যাঙ★অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ★মহাপ্রলয়★যুদ্ধবাজ★প্রিন্সেস হিয়া★মৃত্যুফাঁদ★শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা ★মায়ান ট্রেজার ★ঝড়ের পূর্বাভাস★আক্রান্ত দূতাবাস★জন্মভূমি দুর্গম গিরি ★মরণযাত্রা ★মাদকচক্র ★শকুনের ছায়া★তুরুপের তাস★কালসাপ গুডবাই, রানা★সীমা লঙ্ঘন★রুদ্রঝড়★ কান্তার মরু★ কর্কটের বিষ★বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিভিআইপি লাউঞ্জ। পুরু কাঁচের দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের প্রধান, মেজর জেনারেল (অব·) রাহাত খান। নজর বাইরে।

ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, দু'হাত পিছনে বাঁধা। এয়ারকন্ডিশন্ড লাউঞ্জের দেয়ালে বাষ্পের পর্দা সৃষ্টি করছে তাঁর প্রতিটা নিঃশ্বাস। বৃদ্ধের একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে সোহেল আহমেদ, সংস্থার চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। এক হাত নেই ওর, হাতহীন কোটের আস্তিন দেহের পাশে ঝুলছে।

রানওয়েতে সাদা রঙের একটা ঝলক দেখে আশ্বস্ত হলেন রাহাত খান। ছোট একটা প্লেন, উত্তর মাথায় নেমে দৌড় শুরু করেছে। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিল সোহেল, মৃদু গলায় বলল, 'বিশ মিনিট লেট।'

বৃদ্ধ কেবল মাথা ঝাঁকালেন, কিছু বললেন না। দৌড়ের গতি কমিয়ে মেইন টার্মিনাল ভবন বরাবর ট্যাক্সিওয়েতে ঢুকল প্লেনটা, ধীরগতিতে এগিয়ে আসতে লাগল। লাউঞ্জের কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যস্ততা দেখা দিল। সিভিল ড্রেসের একদল নিরাপত্তা কর্মী অপেক্ষা করছিল লাউঞ্জের আরেক মাথায়, দ্রুত সামনের খোলা চত্বরে চলে গেল তারা।

ট্যাক্সিওয়ের মাথায় এসে দক্ষিণমুখো হলো জেট, অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল ছেড়ে এসে ভিভিআইপি লাউঞ্জ বরাবর থামল। কাঁচের গায়ে নিজের প্রতিফলন দেখে নিলেন রাহাত খান, ব্রিটিশ কায়দায় বাঁধা টাইয়ের নট্ ঠিকঠাক করে নিয়ে পা বাড়ালেন রিসেপশন এরিয়ার দরজার দিকে। সোহেলও চলল পিছন পিছন। এয়ার কন্ডিশন্ড হল থেকে বেরোতেই দুপুরের কড়া রোদে গায়ের চামড়া চিড়বিড় করে উঠল। পাত্তা না দিয়ে 'তিউনিস এয়ার' ছাপ মারা প্লেনটার দিকে এগোলেন বৃদ্ধ। ওটা ততক্ষণে থেমে পড়েছে, অফ করে দেয়া হয়েছে এঞ্জিন।

আওয়াজ পুরোপুরি থেমে যাওয়ার আগেই কেবিন ডোর খুলে গেল ওটার, এক ক্রু ভেতর থেকে বের করে দিল তিন ধাপওয়ালা ফোল্ডিং স্টেপ। প্রায় তখনই দোরগোড়ায় দেখা দিল লম্বা-চওড়া একটা দেহ। মুখ তুলে সরাসরি মেজর জেনারেলের দিকে তাকালেন মানুষটা, মৃদু হাসির আভাস খেলে গেল তাঁর বড়সড় মুখে। বেশ বয়স্ক ভদ্রলোক, প্রায় রাহাত খানের মতই।

দুই পদক্ষেপে টারম্যাকে নেমে এলেন তিনি। মুখে চওড়া হাসি। 'হ্যালো, ফ্রেন্ড,' প্রকাণ্ড থাবা দিয়ে রাহাত খানের বাড়ানো হাত মুঠো করে ধরলেন। 'কেমন আছ তুমি?' আরেক হাতে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে।

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'ভাল আছি। তুমি কেমন, আরাবী?'

'শুকর আলহামদুলিল্লাহ্! শুকর আলহামদুলিল্লাহ্!'

জোর করে নিজেকে অতিথির আলিঙ্গনমুক্ত করলেন রাহাত খান, দু'ফুট দূর থেকে তাঁকে ভাল করে দেখলেন। 'তুমি এখনও আগের মতই আছ দেখছি।'

'তুমিও বদলাওনি। কত বছর হয়ে গেল, অথচ মনে হচ্ছে যেন কালই দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে।'

স্মিত হাসলেন রাহাত খান, ইঙ্গিতে সোহেলকে দেখালেন। 'মীট সোহেল, আমাদের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সোহেল আহমেদ। সোহেল, ইনি জেনারেল সালেহ্ দীন আরাবী, পিএলও-র স্পেশাল অপারেশনস্ চীফ।'

পরিচয় পর্ব শেষ হতে লাউঞ্জের দিকে এগোল ছোট দলটা। পিছন পিছন এল জেনারেলের দুই সামরিক উপদেষ্টা ও দুই সেক্রেটারি। শেষের দু'জনের হাতে বড় সাইজের দুই ব্রীফকেস। ধরার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় বেশ ওজনদার।

কাস্টমসকে তিউনিস এয়ারের যাত্রীদের সম্পর্কে বিসিআই ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে অফিশিয়ালি বলা ছিল, কাজেই কোনরকম প্রশ্ন বা চেকিঙের মুখোমুখি হতে হলো না। কেবল অতিথিদের পাসপোর্টে এন্ট্রি সীল মেরে ছেড়ে দেয়া হলো। দু'মিনিট পর দুটো কালো ক্যাডিলাক রওনা হয়ে গেল ঢাকার উদ্দেশে।

ছোটখাট এক দিবানিদ্রা দিয়ে উঠে পড়ল মাসুদ রানা, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। এ মুহূর্তে অবশ্য নামেই উজ্জ্বল, দীর্ঘ দিন ধরে মনের মত কাজ নেই বলে মিট্‌মিট্ করছে। ওর মনের মত কাজ হলো অফিশিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট, প্রতি মুহূর্ত মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়া। দেশে হোক বা বিদেশে, দেশের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের সমূলে বিনাশ করা।

গত তিন মাস ধরে সেই কাজটি জুটছে না ওর ভাগ্যে। অবস্থা দেখে মনে হয় সব মানুষ তওবা পড়ে ভাল হয়ে গেছে। নাশকতামূলক তৎপরতা ছেড়েছুড়ে সাধু বনে গেছে। এদিকে যে রানার সমস্যা হচ্ছে, তা যেন টেরই পাচ্ছে না ব্যাটারা।

একটা-দুটো নয়, বহুমুখী সমস্যায় আছে ও। রুটিন কাজ ছাড়া অফিসে কোন কাজ নেই, তাই সকালে ঘর ছাড়ার বিশেষ জরুরী তাগিদ অনুভব করে না। ভোরে উঠে খানিক ব্যায়াম করে ফের গড়ায়, তারপর রাঙার মার নাস্তা খাওয়ার তাড়া থেকে বাঁচতে সাড়ে আটটার দিকে ওঠে। শাওয়ার-শেভ সেরে এসে বসে ডাইনিং টেবিলে।

তখনই শুরু হয় আসল সমস্যা। ফযরের নামাজ শেষ করে সেই যে নাস্তা তৈরি করতে বসে বুড়ি, শেষ হতে কম করেও আটটা বাজে। কত পদের যে খাবার, গুনে শেষ করা যাবে না। তার সব খেতে হয় রানাকে, অন্তত অল্প অল্প করে হলেও। কোন আইটেম বাদ দেয়া যাবে না। তাহলেই শুরু হয়ে যায় বুড়ির ম্যারাথন ঘ্যানঘ্যানানি।

ওই জিনিসটার হাত থেকে বাঁচতে চোখ-কান বুজে খেয়ে নেয় ও। অফিসের কাজের কথা বলে দুপুর বেলাটা কোনমতে পালিয়ে বাঁচে, কিন্তু রাতে ফের সেই সমস্যা। হাজার নিষেধ করলেও কানে তোলে না রাঙার মা। অভিযোগ-অনুযোগ, রাগ, বিরক্তি, ধমক, সব তার এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

প্রথম প্রথম অন্য টেকনিক খাটানোর চেষ্টা করে দেখেছে রানা, বুড়ির হাজারো অনুরোধ উপেক্ষা করে অল্প অল্প খেয়ে তাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে দেখেছে। তাতে বরং ফল হয়েছে উল্টো। একবার টানা তিন দিন অভিমান করে না খেয়ে থেকেছে বুড়ি, তারপর মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে সে কি বিচ্ছিরি কাণ্ড! ডাক্তার, স্যালাইন, শুশ্রূষা, সব মিলিয়ে দু'দিনের ধাক্কা।

ওই ধাক্কায় আক্কেল হয়ে গেছে রানার, পাকা তওবা করেছে, আর না। ঢাকায় থাকলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অন্তত বুড়ির

ইচ্ছের বাইরে যাবে না কখনও। যতই কষ্ট হোক সহ্য করে নেবে।

কিন্তু এবার সে প্রতিজ্ঞার দেয়াল টলোমলো হয়ে উঠেছে, ভেঙে পড়ে পড়ে অবস্থা। মনের সুখে টানা তিন মাস ধরে যে ভোগান ভোগাচ্ছে বুড়ি, তাতে ব্যায়ামের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েও কাজ হচ্ছে না, ভুঁড়ি বের হয়ে পড়ার দশা হয়েছে। কাজেই পালাই পাল্লাই করছে মনটা।

এক কাপ কফি খেয়ে বাগান পরিচর্যায় যাবে ঠিক করল রানা। নতুন কিছু ফুলের চারা লাগিয়েছে গত সপ্তাহে, ওগুলোর গোড়ার মাটিতে নিড়ানি দেয়া দরকার। কিন্তু ভাবনাটা শেষ করতে পারল না, তার আগেই বেজে উঠল টেলিফোন। হাত বাড়িয়ে রিসিভার কানে তুলল ও, 'ইয়েস!'

ও প্রান্ত থেকে সোহেলের জঘন্য একটা গাল ভেসে এল। 'আজ অফিসে আসিস্‌নি কেন?'

মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল রানা। 'কি?'

'বলছি আজ অফিসে আসিস্‌নি কেন, শা-লা!'

'তোর কাছে তার কৈফিয়ত দিতে হবে?'

'নিশ্চই দিতে হবে!' খেঁকিয়ে উঠল সোহেল। 'আলবৎ দিতে হবে, একশো বার দিতে হবে! কতবড় সাহস দেখেছ, বসের বসকে বলে কি না...'

'থাম্, শালা!' কড়া দাবড়ি লাগাল ও। 'পায়ের নাগালে থাকলে এখনই এক লাথিতে তোর বস্‌গিরি ছুটিয়ে দিতাম। কেন কল করেছিস বল্, তারপর দূর হ'! জরুরী কাজ আছে আমার।'

আপোসের ভাব ফুটল সোহেলের গলায়, পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'শোন, আমি হচ্ছি তোর এমপ্লয়ার! দ্যাট ইজ, মনিব। মনিবদের সাথে কি ভাষায় কথা বলতে হয়...'

'ফের ফাজলামো হচ্ছে!'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। 'ফাজলামো মনে হচ্ছে? বেশ। মাস শেষে বেতনের সময় যখন রিটেন এক্সপ্ল্যানেশন কল করা হবে, যখন দেখবি সাতদিন উইদাউট পে করা হয়েছে তোকে, তখন যেন হাত পা ধরে কান্নাকাটি শুরু করে দিস্‌নে।'

হেসে ফেলল রানা। 'শালা! খুব মৌজে আছিস মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারিস। একটু আগে অফিসের পয়সায় শেরাটনে লাঞ্চ খেয়ে এলাম কি না! রাতেও আবার দাওয়াত আছে বুড়োর বাসায়। এক দিনে দু'দুটো শানদার খানা, বুঝিসই তো!'

চোখ কুঁচকে উঠল রানার। 'ব্যাপার কি রে?'

'ওসব তুই বুঝবিনে, দোস্ত। হাই অফিশিয়ালদের ব্যাপার। তোর মত ফোর্থ ক্লাস এমপ্লয়ীর ওসবের মজেজা বোঝার কথা নয়।'

'কাজের কথা বলবি, না ফোন রেখে দেব?'

'রাখবি? রাখ্ তাহলে। দাঁড়া, দাঁড়া! আরেকটা যেন কি বলব ভেবেছিলাম, ও হ্যাঁ, বুড়ো তোকে ডেকেছে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা। 'ডেকেছে মানে?'

'ডেকেছে মানে ডয় এ-কার কয় এ-কার ছয় এ-কার, শালা গাঢ়ল!' ফের খেঁকিয়ে উঠল সোহেল। 'সোজা বাংলা বোঝো না? নাহ্, এই শালাদের নিয়ে কি করে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা সংস্থা চালাব, মাথায়ই আসে না আমার।'

'বুড়ো ডেকেছে' শুনেই গায়ের মধ্যে কেমন এক শিহরণ বয়ে গেল ওর, তাই সোহেলের আপত্তিকর মন্তব্য মোটেও আমল দিল না। 'কেন ডেকেছে রে? কখন যেতে হবে?'

'কখন মানে? এক্ষণ, এই মুহূর্তে বের হ' বাসা থেকে।'

কথা বের করার স্বার্থে চোটপাট না দেখানোর সিদ্ধান্ত নিল

রানা। নরম গলায় বলল, 'ব্যাপার কি রে, দোস্ত? বুড়োর ডাকের খবর এত দেরিতে জানাচ্ছিস, তার মানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়?'

'এত কথায় তোর দরকার কি রে! বস্ মানুষ, ডেকেছি, সোজা চলে আসবি, তা না, রাজ্যের ভ্যাজর ভ্যাজর!'

'আহা, তা না হয় আসছি,' বহুকষ্টে মেজাজ শান্ত রেখে বলল ও। 'কিন্তু ব্যাপারটা কি, একটু আভাস অন্তত দে।'

এতক্ষণে সদয় হলো সোহেল। 'তা···এত করে যখন অনুরোধ করছিস্, তখন বলেই ফেলি। মনে হচ্ছে তোর ভাগ্যে শিঁকে ছিঁড়তে চলেছে, তাই ডাক পড়েছে।'

বুকের মধ্যে গরম রক্ত ছলকে উঠল ওর, রিসিভার ঠেসে ধরল কানের সাথে। 'সত্যি?' জবাবের অপেক্ষায় না থেকে আবার বলল, 'আজ হঠাৎ হোটেল শেরাটনে লাঞ্চ খেতে গেলি কেন রে?'

'কি মুশকিল! জেনারেল আরাবীকে নিয়ে শেরাটনে লাঞ্চ খাব না তো কি রাস্তার ধারে আলী মিয়ার 'ফডোলে' খাব?'

'জেনারেল···' থমকে গেল মাসুদ রানা, 'কে! জেনারেল আরাবী? সালেহদীন আরাবী?'

'হুম্,' ভারিক্কি চালে বলল সোহেল।

'উনি ঢাকায়?' অনেকক্ষণ পর বলল ও। 'কখন এসেছেন?'

'সে তো কখন, দুপুরের আগে।'

ঘড়ি দেখল রানা-প্রায় সাড়ে চারটা বাজে। বিড়বিড় করে বলল, 'আশ্চর্য! এই খবর এতক্ষণ পর দিচ্ছিস?'

চুক্ করে বিরক্তি প্রকাশ করল সোহেল। 'ভ্যালা মসিবত তো! শালা অফিসও কামাই করবে, আবার উল্টে কৈফিয়তও দাবি করবে, তোর···'

আচমকা রাগে ফেটে পড়ল ও। 'আজ যদি জুতোপেটা করে তোর এক গাল তুবড়ে না দিয়েছি, তো আমার নাম মাসুদ রানা

নয়। দাঁড়া, শা-লা, আসছি আমি।'

সোহেলের হি-হি হাসি শুনে রাগে গা জ্বলে গেল রানার, দড়াম করে রিসিভার রেখে দিল।

তৈরি হতে সময় লাগল পাঁচ মিনিট, তারপর রাঙার মাকে রাতে আজ বাসায় খাচ্ছে না, এই দুঃসংবাদটা দিয়ে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করতে দু'মিনিট, সাত মিনিটের মাথায় রাস্তায় উঠে তুমুল বেগে মতিঝিলের দিকে গাড়ি ছোটাল রানা। মনটা রঙিন প্রজাপতির মত ফুরফুরে হয়ে উঠেছে। জেনারেল আরাবী ঢাকায় মানেই গুরুতর পরিস্থিতি, জেনারেল আরাবী মানেই প্যালেস্টাইন, জেনারেল আরাবী মানেই···!

জোর করে উত্তেজনা দমন করল ও, কিছু না শুনেই বেশি কিছু আশা করা ঠিক হচ্ছে না। লালমাটিয়ার বাংলো থেকে মতিঝিল পৌঁছতে সাধারণত দশ মিনিট লাগে ওর, আজ লাগল মাত্র ছয় মিনিট; সোহেলের সাথে কয়েক সেকেন্ডের মক্‌ফাইট সেরে যখন রাহাত খানের ঝকঝকে পালিশ করা দরজায় নক্ করল, তখন বাজে ঠিক পাঁচটা।

বুড়োর গুরুগম্ভীর 'কাম ইন!' শুনে আরেক দফা রক্ত ছলকাল ওর বুকের মধ্যে, মনে মনে বিসমিল্লাহ্ বলে ঢুকে পড়ল ঘরে। ভেতরে বড়জোর দু'পা এগিয়েছে, এরমধ্যে দশ হাত মত দূরত্ব প্রায় উড়ে পেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ জেনারেল, দু'হাতে সজোরে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন ওকে। সত্তর ছাড়ানো বিশালদেহী মানুষটার গতি দেখে তাজ্জব হয়ে গেল রানা।

কোনমতে সামলে নিয়ে নিজেকে ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও, সেই সাথে জেনারেলের ঝোড়োগতির একের পর এক প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল। অবশেষে রেহাই মিলল, রাহাত খানের নীরব ইঙ্গিতে বসে পড়ল ও জেনারেল আরাবীর পাশের চেয়ারে। তখনই

রূমে উপস্থিত আরও দু'জনের ব্যাপারে সচেতন হলো ও। দু'জনেই বয়স্ক। একজন টেকো, অন্যজনের মাথায় চুল আছে, তবে অল্প। একটা ব্যাপারে মিল রয়েছে দু'জনের, ভীষণরকম ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ওঁরা। চোখ দেখলে মনে হয় অনেক রাত ঘুমের সঙ্গে দেখা হয়নি।

জেনারেল আরাবীর দিকে নজর দিল ও। দেখল তিনিও ক্লান্ত। দু'চোখ জবাফুলের মত লাল। নিজের দুই সঙ্গীর সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। নীরবে হ্যান্ডশেক সেরে আবার বসল রানা, ওর আশা ততক্ষণে আকাশ ছুঁয়েছে। মন বলছে, এতদিনে বোধহয় একঘেয়ে জীবনের একটা হিল্লে হতে যাচ্ছে।

রাহাত খানের সামনে বড়, সাদা এক শীট কাগজ দেখতে পেল ও, লাল কালিতে খুব সম্ভব একটা ম্যাপ আঁকা আছে ওটায়। বৃদ্ধের লাল কলমটা খোলা অবস্থায় শীটটার পাশেই রয়েছে দেখে অনুমান করল শিল্পকর্মটি তাঁরই। ম্যাপের এখানে-ওখানে কিছু ফিগার লেখা। ম্যাপের পাশে, রাহাত খানের বাঁ কনুইয়ের কাছে এক হাত উঁচু ছবির পাহাড়। দেখে মনে হচ্ছে স্যাটেলাইটের তোলা। রূমের এক মাথায় দেয়ালমুখো করে রাখা একটা প্রোজেক্টর দেখে চোখ কোঁচকাল ও। ওটা কেন? ভাবল, কিন্তু প্রশ্ন করল না।

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলেন রাহাত খান। 'রানা, তোমার হাতে এখন তো তেমন কোন কাজ নেই, তাই না? ফ্রী আছ।'

'জ্বি, স্যার!' দ্রুত বলল ও। 'অনেকদিন থেকেই কোন কাজ নেই। বসে থেকে...' ব্রেক কষল বৃদ্ধকে ভুরু কোঁচকাতে দেখে। 'এত কথা কে শুনতে চেয়েছে' ধরনের ভঙ্গি করলেন তিনি।

'আরাবী এসেছে ওদের, মানে, ফিলিস্তিনীদের হয়ে একটা

কাজ করে দেয়ার অনুরোধ নিয়ে। শুধু ওদেরই নয়, এর সাথে মিশর, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন–সবার স্বার্থ জড়িত। তোমার যদি আপত্তি না থাকে…'

'কোন আপত্তি নেই, স্যার!' হড়বড় করে বলে উঠল ও। 'আমি রাজি।'

দ্রুত চোখাচোখি হলো দুই বৃদ্ধের। দেখেও না দেখার ভান করল রানা। 'কাজটা কি, স্যার?'

'একটা কমান্ডো মিশন লীড করতে হবে তোমাকে,' রাহাত খান বললেন। 'ইসরাইলের ভেতরে গিয়ে ওদের একটা নিউক্লিয়ার রকেট প্ল্যান্ট উড়িয়ে দিতে হবে।'

ওর নীরবতাকে দ্বিধার লক্ষণ ভেবে আরাবী তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, 'ওই প্ল্যান্টের হাত থেকে বাঁচার কোন উপায় দেখছিলাম না আমরা এতদিন। তাই খুব শর্ট নোটিসে চলে এলাম সমস্যাটা রাহাতকে জানিয়ে কোন সমাধান খুঁজে বের করা যায় কি না দেখতে।' শ্রাগ করলেন বৃদ্ধ। 'আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানী, শেষ পর্যন্ত পথ বাতলে দিয়েছে রাহাত। গত কয়েক মাস ধরে প্রচুর মাথা খাটিয়েও এর কোন সমাধান বের করতে পারিনি আমরা, অথচ রাহাত মাত্র কয়েক ঘণ্টায়…'

'ওসব এখন থাক, আরাবী,' বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন রাহাত খান। 'এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরেও করা যাবে, এখন মূল বিষয়টা ওকে জানানো দরকার।'

রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'যেতে রাজি থাকলে আজই আরাবীর সঙ্গে রওনা করতে হবে তোমাকে, রানা।'

'অসুবিধে নেই, স্যার,' দ্বিধাহীন চিত্তে জবাব দিল ও।

'থ্যাঙ্ক ইউ, সান,' অস্ফুটে বললেন আরাবী। 'কেন জানি না আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ঢাকা থেকে খালি হাতে ফিরতে হবে না

আমাকে। রাহাত, তুমি, তোমরা যে আমাদের কতবড় বন্ধু, আজ আবার তা নতুন করে অনুভব করছি। তোমাদের এত ঋণ...'

'তুমি থামবে?' কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে বন্ধুকে দেখলেন রাহাত খান। 'আগে কাজের কথা শেষ করো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন জেনারেল। 'কি যেন...?'

অনেক কষ্টে হাসি চাপল রানা। 'কমান্ডো দলের সদস্য কতজন, জেনারেল?'

'রাহাতের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তোমাকে সহ ছয়জন হলেই চলবে।'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'অন্যরা?'

'সে আমরা কালকের মধ্যেই ঠিক করে ফেলব। সংশ্লিষ্ট সব দেশ থেকে একজন করে কমান্ডো নিয়ে দল গড়তে চাই আমি। সেরাদের নিয়ে।' একটু থামলেন তিনি। 'তুমি তো অনেককে নিয়ে কাজ করেছ ওই অঞ্চলে, বিশেষ কারও নাম সাজেস্ট করতে চাইলে...' থেমে গেলেন কথা শেষ না করে।

'লেফটেন্যান্ট আতাসীকে পাওয়া গেলে ভাল হয়।'

হাসি ফুটল জেনারেলের বড়সড় মুখে। 'আমি জানতাম, রানা। অলরাইট, আতাসীর অন্তর্ভুক্তি কনফার্ম হয়ে গেল, আর চারজন থাকল তাহলে। ভেবো না, খুব শর্ট টাইমে আয়োজন সেরে ফেলব। বিশেষ কোন অসুবিধে যদি দেখা না দেয়, আমার ইচ্ছে তিনদিনের মধ্যে "ডুমস্ডে মিশন" তার কাজ...'

'ডুমস্ডে মিশন?' প্রশ্ন করল রানা।

'হ্যাঁ। রাহাত এই নাম রেখেছে মিশনের, "ডুমস্ডে"। পছন্দ হয়েছে আমার। একদম মানানসই হয়েছে।'

লাল কলমটা স্ট্যান্ডে রেখে ম্যাপ ভাঁজ করে জেনারেল আরাবীর দিকে এগিয়ে দিলেন রাহাত খান। বুক পকেটে রাখলেন

তিনি ওটা, দুই সঙ্গীকে নির্দেশ দিলেন স্যাটেলাইটের ছবি ব্রীফকেসে ভরে ফেলতে। এরপর রানার দিকে ফিরলেন। মিশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন ওকে, শুনে তাজ্জব বনে গেল রানা। দীর্ঘদিন ধরে যে মহাসমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছিল মধ্যপ্রাচ্য, মাসের পর মাস মাথা খাটিয়েও যার কোন সমাধান বের করা সম্ভব হয়নি, রাহাত খান মাত্র কয়েক ঘণ্টায় তার জলবৎ তরলং সমাধান করে দিয়েছেন দেখে বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল ওর।

প্ল্যানটা যেমন সহজ, তেমনি অবিশ্বাস্য।

বুড়োর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গেল ওর। ভাবল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুখোড় স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে এমনি এমনি নাম করেননি রাহাত খান। জেনারেল আরাবীর বক্তব্য শেষ হতে ওর দিকে ফিরলেন তিনি। 'রানা, আরাবীর অনারে রাতে আমার বাসায় ছোটখাট এক ডিনার পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। তোমারও দাওয়াত রইল।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

ছোটখাট নয়, দেখা গেল শানদার খানাপিনার আয়োজনই করেছে বুড়োর কুক। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে মিশন নিয়ে জেনারেল আরাবীর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গেল রানা, গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো জেনে নিল এক এক করে।

এগারোটার দিকে এয়ারপোর্টে পৌঁছল দলটা। রাহাত খান থাকলেন সঙ্গে, সোহেলও। প্লেনের সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে রানার উদ্দেশে নিচু গলায় বললেন বৃদ্ধ, 'বি কেয়ারফুল, রানা।'

সোহেল এক হাতে জড়িয়ে ধরল ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। ভারি কণ্ঠে বলল, 'কাজ সেরে ভালয় ভালয় ফিরে আসতে হবে তোকে, রানা। আজ তিনটে চাঁটি বেশি মেরেছিস্ তুই, ওগুলোর শোধ তুলতে হবে না?'

সবার চোখ এড়িয়ে আরেকটা চাঁটি লাগাল ও। হাসিমুখে বলল, 'বেজোড় সংখ্যা ভাল নয়, তাই হালি পুরিয়ে দিয়ে গেলাম।'

একটু পর উড়াল দিল তিউনিস এয়ারের খুদে জেট, বড় এক বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেল দক্ষিণ আকাশে।

দুই

দু'দিন পরের কথা। কায়রো। গভীর রাত।

ছাব্বিশে জুলাই রোডের হলদে রঙের এক ভবন, আফ্রো-এশিয়ান লেখক সঙ্ঘের অফিস। অতীতের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওটার সাথে। এক সময় যথেষ্ট কর্মব্যস্ত ছিল অফিসটা, মাঝে দীর্ঘদিন বিরতির পর আজ ফের ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

কয়েক দফায় বেশ কিছু লোককে ভেতরে ঢুকতে দেখা গেছে, ছয় নম্বর আঁটা সেই চেনা কনফারেন্স রুমে সবাই উপস্থিত—রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলছে।

লম্বা কনফারেন্স টেবিলের দু'দিকে মুখোমুখি বসা দশজন। একদিকে মিশর, সিরিয়া ও জর্ডানী গোয়েন্দা সংস্থার তিন প্রধান এবং ইয়াসির আরাফাতের প্রধান সামরিক উপদেষ্টা ও আল-ফাতাহ সিক্রেট অপারেশনস্ চীফ, জেনারেল সালে-দীন আরাবী। ওঁদের পিছনের দেয়ালে রাহাত খানের আঁকা মধ্যপ্রাচ্যের সেই ম্যাপটা টাঙানো, ওটার বিশেষ বিশেষ জায়গায় লাল কালির নতুন কিছু মোটা দাগ দেখা যাচ্ছে।

অন্যদিকে বসেছে ছয়জন। এরা অল্পবয়সী, বাইশ থেকে ত্রিশের মধ্যে বয়স। মাসুদ রানা, সিরিয়ান ক্যাপ্টেন সাদিক মাহের, জর্ডানিয়ান লেফটেন্যান্ট জাবের আল মসউদ, মিশরীয় ক্যাপ্টেন আব্বাস ও সার্জেন্ট জুবায়ের পাশা, এবং লেফটেন্যান্ট আতাসী। আতাসী সিরিয়ান, কিন্তু বহু বছর ধরে মিশরে আছে। রানা ও সে ছাড়া অন্য সবাই যার যার দেশের সেনাবাহিনীর সদস্য। কমান্ডো। পাহাড়ী যোদ্ধা। জুবায়ের পাশা ওয়্যারলেস অপারেটর।

কনফারেন্স-রুমে পিনপতন নীরবতা। উল্টোদিকের সবার নজর বিশালদেহী জেনারেল আরাবীর ওপর, কারণ তিনিই কথা বলছিলেন এতক্ষণ। ঝাড়া দু'মিনিট বিরতি দিয়ে আবার মুখ খুললেন বৃদ্ধ, 'এখানে আমাদের জড় হওয়ার কারণ সবাই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছ আশা করি?'

রানা বাদে আর সবাই মাথা দোলাল। 'গুড!' উঠে পড়লেন তিনি। লম্বা একটা ছড়ি হাতে। ওটার সরু ডগা দিয়ে ঠুক্-ঠুক্ আওয়াজ তুললেন ম্যাপের এক জায়গায়। 'এই হচ্ছে সিরিয়া-ইসরাইল-লেবানন বর্ডারের সেই জায়গা, হেবরান মাউন্টেন। সোয়া নয় হাজার ফুট উঁচু। বছরে আট মাসই বরফে ঢাকা পড়ে থাকে এর চুড়ো।'

মাথা দুলিয়ে তাঁকে সমর্থন জানালেন সিরীয় গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান, মেজর জেনারেল (অব.) আবদ আল সাউদ। ভদ্রলোক মোটাসোটা, উচ্চতা মাঝারি, ক্লীন শেভড্। বয়স পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরের মধ্যে। গোলান মালভূমি নিয়ে ইসরাইলের সাথে লড়াইয়ে বীরত্বের জন্যে সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব পেয়েছিলেন।

'এই পাহাড়ের চুড়োর কাছে মেতুলা গ্রামে রয়েছে সিরিয়ান স্নো অ্যান্ড মাউন্টেন ওঅরফেয়ার ট্রেনিং স্কুল,' ওখানটায় ছড়ি

ঠুকলেন জেনারেল আরাবী। 'এর পঞ্চান্ন মাইল দক্ষিণে তোমাদের "মিশন ডুমসডে-র" টার্গেট। তোমরা জানো ওটা ইসরাইলের ভেতরে।' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করলেন তিনি।

এবারও রানা বাদে অন্য পাঁচজন মাথা ঝাঁকাল।

'অল রাইট। প্রথমে এই স্কুলে যাচ্ছ তোমরা,' ছড়ি দিয়ে ম্যাপে খোঁচা মারলেন বৃদ্ধ। 'এটা হচ্ছে মিশনের স্টার্টিং পয়েন্ট। তোমাদের যে টার্গেট, তার একটা মিনিয়েচার মডেল তৈরির কাজ চলছে ওখানে, ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট কর্নেল হাজির অফিসে,' সরাসরি রানার চোখে চোখ রেখে বললেন তিনি। 'সময় মত দেখতে পাবে সবাই। আমরা যে ওখানে যাচ্ছি, সে খবর পৌঁছে গেছে ক্যাম্পে।'

আবার মাথা দোলালেন আল সাউদ।

'একটু পর বিশেষ প্লেনে দামেস্ক রওনা হব আমরা। তারপর ওখান থেকে এয়ার ফোর্সের...' বাকি কথা অনুচ্চারিত রেখে ফিরে এলেন বৃদ্ধ, বসে পড়লেন নিজের আসনে। সামনে ঢাকা দিয়ে রাখা গ্লাস থেকে এক ঢোক মিনার‍্যাল ওয়াটার খেয়ে এক এক করে ছয় কমান্ডোকে দেখে নিলেন। রানার ওপর স্থির করলেন নজর।

'তোমাদের টার্গেট ইসরাইলের যাফাত নিউক্লিয়ার রকেট লঞ্চিং প্ল্যান্ট। কিন্তু জায়গাটা দেশের অনেক বেশি ভেতরে, তাছাড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থাও খুব কড়া, তাই অতদূর যেতে হবে না তোমাদের। ওটার একশো বিশ মাইল দক্ষিণে ছোট একটা কাজ করতে হবে তোমাদেরকে, তাতেই হবে, বন্যার তোড়ে উড়ে যাবে গোটা প্ল্যান্ট।'

অস্ফুট বিস্ময়ধ্বনি করে উঠল পাঁচ কমান্ডো, কিন্তু মাসুদ রানা নির্বিকার।

'সে প্রসঙ্গে পরে আসছি,' বলে চললেন জেনারেল. 'আগে ওই

প্ল্যান্টে কি চলছে সে সম্পর্কে দু'চার কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। আগেই বলেছি ওটা একটা নিউক্লিয়ার রকেট লঞ্চিং প্ল্যান্ট, কাজেই বুঝতেই পারছ ওটার কাজ কি হতে পারে। আমাদের বন্ধুবেশী পরম শত্রু আমেরিকার সরাসরি মদদে তৈরি হয়েছে ওই প্ল্যান্ট, মিসাইল তৈরি হচ্ছে ওখানে। ভূমধ্যসাগরে গত কয়েক মাসে অন্তত এক ডজন মিসাইল ছুঁড়ে ওগুলোর পাল্লা পরীক্ষা করেছে ইসরাইলীরা। ওয়ারহেড ছাড়া অবশ্য।

'প্রায় চোদ্দশো মাইল পাল্লা মিসাইলগুলোর, ওয়ারহেডসহ হয়তো কিছুটা কম হবে, তবে কতই বা আর কম? বড়জোর বিশ, পঞ্চাশ মাইল? তার মানে ওটার হাত থেকে সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, মিশর, কারও নিস্তার নেই। এমনকি সৌদী আরবের কিছু অংশও পড়বে ওর আওতায়। আমরা ওটার অস্তিত্বের কথা জানার আগে পর্যন্ত ওই প্ল্যান্ট সম্পর্কে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি জেরুজালেম, যেই জানলাম, আপত্তি জানানো হলো, অমনি ওরা দাবি করতে লাগল ওটা শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার হবে।

'মধ্যপ্রাচ্যে নিজ স্বার্থের খাতিরে রাশিয়া আমাদের বন্ধু, যখন দেশটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, তখনও বন্ধু ছিল। ওদের এক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ওই প্ল্যান্ট সম্পর্কে সব তথ্য পেয়েছি আমরা, প্রচুর ছবিও পেয়েছি। রকেট টেস্টিং সহ ওখানকার সমস্ত কর্মকাণ্ডের ছবি আছে আমাদের হাতে। এখানে আমরা ওই প্ল্যান্টের সম্ভাব্য টার্গেটের প্রতিনিধিরা উপস্থিত রয়েছি, কয়েক কোটি মানুষের প্রতিনিধি। নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আমরা।

'কারণ, ইসরাইলকে আমরা বিশ্বাস করি না। দেশটার জন্মই হয়েছে গায়ের জোরের ওপর ভিত্তি করে। জন্মের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোর ওপর কম অত্যাচার করেনি

ওরা। আমাদের জন্মভূমি কেড়ে নিয়েছে, হাজ র হাজার মাকে সন্তানহারা করেছে, বোনকে বিধবা করেছে, মবোধ শিশুদের এতিম করেছে, অথচ পশ্চিমা মিডিয়া এস ার দায়-দায়িত্ব চিরকাল আমাদের কাঁধেই চাপিয়ে এসেছে। ধ্যপ্রাচ্যে একটা গুলি ফুটলেই সমস্ত দোষ হয় মুসলমানদের। অথ

কপালের পাশ চুলকে নিলেন জেনারেল। সে যাক্। বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার চাপে পড়ে হোক, কিংম্বা ভেতরে ছি টফোঁটা পরিমাণ মানবতাবোধ ছিল বলেই হোক, তিরানব্বই ালে প্রধানমন্ত্রী র‍্যাবিন ফিলিস্তিন প্রশ্নে আপোস করতে রাজি হয়ে ছিল, তাই মরতে হয়েছে তাকে উগ্রপন্থী ইহুদীদের হাতে। ওর প থেকে ওই প্রশ্নে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। পরপর কয়েকটা রকার এসেছে, কিন্তু তারা কেবলই টালবাহানা করছে স্বাধী ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা নিয়ে।

'ওদের টালবাহানা নিয়ে আমরা, আমাদের এ তবেশী আর সব মুসলিম দেশ প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ জানিয়ে আসছি, জবাবে ইসরাইল "দিচ্ছি" "দেব" বলে সময় নষ্ট করে । আর এদিকে, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকারের সাহায্যে গড়ে লছে নিউক্লিয়ার রকেট প্ল্যান্ট। ইসরাইল নিজের নিরাপত্তার াজুহাত দেখিয়ে আটাত্তর সালে ইরাকী পারমাণবিক গবেষণাগার ড়িয়ে দিয়েছিল, অথচ সে নিজে "শান্তিপূর্ণ" পারমাণবিক শ ক্তর অধিকারী। ভাবখানা যেন তার থাকলে ক্ষতি নেই, ক্ষতি অ ছ কোন মুসলিম দেশের থাকলে। ধরা পড়ার পর এখন এই যাফা প্ল্যান্টকেও ওরা "শান্তিপূর্ণ" কাজে ব্যবহার হবে বলে সাফাই গা ত চাইছে।

'কিন্তু আমরা জানি ভেতরে কি চলছে। স্যা টলাইটের তোলা অসংখ্য ছবি আমাদের আশঙ্কাই সত্যি বলে রায় াচ্ছে। ওখানকার টেস্টিং গ্রাউন্ডে যে রকেট ওরা লঞ্চ করছে, তা রেঞ্জ মোটামুটি

চোদ্দশো মাইল। অর্থাৎ আমাদের তো বটেই, মিশর, জর্ডান, সিরিয়া, সবার সামনেই সমূহ বিপদ। ওদের এই প্ল্যান্ট খাড়া করার কোন কারণও খুঁজে পাচ্ছি না আমরা। তবে সহজ যুক্তি বলে, বফিলিস্তিন প্রশ্নে টালবাহানা চালিয়ে যাবে বলেই হয়তো ওটার জন্ম হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলো যদি এ নিয়ে বেশি চাপ দেয়, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখন ওই প্ল্যান্টের কার্যকারিতা প্রমাণ হবে। কাজেই ওটাকে শেষ করে দেয়া ছাড়া কোন বিকল্প উপায় আমাদের নেই।

'মধ্যপ্রাচ্যের কয়েক কোটি মানুষের ভাগ্য এখন তোমাদের ছয়জনের ওপর নির্ভর করছে,' রানার চোখে চোখ রেখে বললেন জেনারেল আরাবী। আবেগে গলা কাঁপছে। 'আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, মাসুদ রানার যোগ্য নেতৃত্বে সফল হবে তোমাদের মিশন। হবেই।'

আরও দু'ঢোক পানি খেলেন বৃদ্ধ। একটু চুপ করে থেকে মুখ খুললেন, 'সমস্যাটা আমাদের বেশি। তাই আমরাই আগে পদক্ষেপ নিয়েছি, বন্ধুদের সাহায্য চেয়েছি,' দু'পাশে বসা তিন প্রধানকে ইঙ্গিত করলেন। 'এবং এঁরা খুশিমনে সাহায্য করছেন আমাদের। মিশনের কো-অর্ডিনেশনের দায়িত্বও তুলে দিয়েছেন আল-ফাতাহ্‌র কাঁধে। কাজেই আমি এর অফিশিয়াল সুপ্রীম কমান্ড, আর মাসুদ রানা,' মৃদু হাসি খেলে গেল তাঁর ঠোঁটে, 'মাসুদ রানা ফিল্ড কমান্ড।'

সিরিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান নিচু গলায় কিছু বলতে হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। 'সময় আর বেশি নেই। তোমাদের কারও কোন প্রশ্ন আছে? রানা?'

মাথা দোলাল ও, 'না, জেনারেল।'

'তোমাদের কারও?'

ডান হাত উঁচু করেই নামিয়ে নিল সিরিয়ান সাদিক মাহের বাইশ-তেইশ হবে বয়স।

'আমার আছে, স্যার।'

'ইয়েস, গো অ্যাহেড!'

'সমস্যাটা আমাদের, মধ্যপ্রাচ্যের,' বলল যুবক। 'এর সমাধানে আমরাই যথেষ্ট, বাইরের একজনকে কেন নেয়া হলো এর মধ্যে?'

মুহূর্তে ঘরের পরিবেশ বদলে গেল। জেনারেল আরাবীসহ তাঁর তিন সহযোগীর ভুরু কুঁচকে উঠল। স্পষ্ট বিরক্তি ফুটল সবার চেহারায়। আল সাউদের চেহারা লাল। এদিকে লেফটেন্যান্ট আতাসীর অবস্থাও এক, কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে আছে সাদিকের দিকে। জর্ডানিয়ান মসউদের চেহারা দেখে মনে হলো সাদিকের প্রতি সমর্থন আছে তার। অন্যরা নির্বিকার। রানাও। একমনে হাতের তালু দেখছে।

'প্রশ্ন করতে বলা হয়েছে বলেই যা-তা প্রশ্ন করতে পারো না তুমি,' গমগমে স্বরে বললেন সিরিয়ান গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান। 'অন্তত একজন সৈনিক হয়ে সুপিরিয়রদের সিদ্ধান্ত নিয়ে এমন প্রশ্ন তোলা উচিত হয়নি তোমার।'

'কিন্তু, স্যার, আমি সিরিয়ান রেগুলার আর্মির ক্যাপ্টেন, আমি...'

'এনাফ!' গর্জে উঠলেন আল সাউদ। 'যে-মুহূর্তে এই রূমে পা রেখেছ সেই মুহূর্তে তুমি তোমার র‍্যাঙ্ক হারিয়েছ। এখানে তুমি স্রেফ সৈনিক, আর কিচ্ছু নও। বুঝতে পেরেছ?'

'শান্ত হোন,' এক হাত তুললেন জেনারেল আরাবী। 'আমাকে বলতে দিন।' অসন্তুষ্ট সাদিক মাহেরের দিকে তাকালেন। 'ইয়াং চ্যাপ, তোমার এই প্রশ্নের জবাব দিতে মিশনের কমান্ড কাউন্সিল

বাধ্য নয়। তবু আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি, মেজর মাসুদ রানা অতীতে আমাদের হয়ে, মানে আরবদের হয়ে অনেক কমান্ডো মিশনে নেতৃত্ব দিয়েছে, এবং তার প্রতিটা মিশন শতকরা একশো ভাগ সফলও হয়েছে।

'সেসব মিশনের লিখিত রেকর্ড অন্যসব দেশের মত তোমাদের মিলিটারি আর্কাইভেও আছে, যদি দেশে ফিরতে পারো কাজ সেরে, পড়ে নিয়ো। কাজে আসবে। এখানেও তার একজন সাক্ষী আছে, সে লেফটেন্যান্ট আতাসী। সুযোগ পেলে ওর কাছ থেকেও শুনে নিতে পারো কেন নেয়া হয়েছে মেজর মাসুদ রানাকে। আমি নিয়ে এসেছি।'

অমায়িক হাসি ফুটল জেনারেলের বড়সড় মুখে। 'ওকে রাজি করানোর ক্রেডিটটা তুমি আমাকে দিতে পারো। পুরনো বন্ধু বলে রানার কাছে খাতিরটা পেয়েছি আমি, অন্য কেউ হলে হয়তো...' শ্রাগ করলেন তিনি। 'আরও আছে। তোমরা যে মিশনে চলেছ। "ডুমস্‌ডে", তার সমগ্র পরিকল্পনাটাই মেজর রানার বস্, মেজর জেনারেল রাহাত খানের মাথা থেকে বেরিয়েছে। ভদ্রলোক খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একসাথে লড়েছি আমরা।'

'আশা করছি তোমার উত্তর পেয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ, জেনারেল!' বলে রানার দিকে ফিরল সাদিক। 'সরি, মেজর।'

'দ্যাট'স অলরাইট,' বলল ও। বলল বটে, কিন্তু এ-ও বুঝল পুরো সন্তুষ্ট হতে পারেনি ছেলেটা। কিন্তু এখন তা নিয়ে ভাবনার সুযোগ নেই। সময় হয়ে এসেছে। 'আমি কিছু মনে করিনি।'

'তোমাদের মিশন কোনও অ্যামেচার ক্লাবের অ্যাডভেঞ্চার নয়,' বলে উঠলেন জেনারেল। 'বরং পুরোমাত্রার এক আর্মি কমান্ডো মিশন। মিশন সফল করতে হলে দলের সবাইকে বিনা

প্রশ্নে নেতার নির্দেশ মেনে চলতে হবে। তাতে যদি কারও বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকে, তাহলে এখনই বলে ফেলো। বেয়াড়া প্রশ্ন একটা যখন উঠেই পড়েছে, আরও আছে কি না জেনে নেয়া যাক্।'

রানা বাদে আর সবার মুখের ওপর নজর বোলালেন বৃদ্ধ। 'আছে কারও কোন প্রশ্ন বা আপত্তি?'

কেউ মুখ খুলল না।

'অর্থাৎ আমরা ধরে নিতে পারি নেই?'

'যদি থাকে,' জর্ডানিয়ান মসউদ বলল। 'সমাধান কি করে করবেন, স্যার?'

'যার আছে, তাকে দল থেকে বাদ দিয়ে,' দ্রুত, কাটা কাটা জবাব দিলেন জেনারেল। 'এবং তাকে তার কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে।'

'অর্থাৎ কোর্ট মার্শাল?'

'অফ কোর্স কোর্ট মার্শাল!' চাপা ক্রুদ্ধ গলায় প্রতিক্রিয়া জানালেন জর্ডানিয়ান গোয়েন্দা প্রধান। ভদ্রলোক বেসামরিক কর্মকর্তা, ছোটখাট মানুষ। বাদশা হোসেনের চাচাত ভাই। 'আগেই বলা হয়েছে এটা পুরোমাত্রার আর্মি কমান্ডো মিশন, আবোল-তাবোল কারণে মিশন ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার প্রতিকার অবশ্যই সামরিক নিয়ম অনুযায়ী করা হবে।'

শ্রাগ করল মসউদ। 'প্রশ্নটা আমি এমনিই করেছি, স্যার। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে করিনি।'

'অর্থাৎ নেতৃত্বের প্রশ্নে তোমার কোন আপত্তি নেই?' জেনারেল আরাবী বললেন।

'প্রশ্নই আসে না, জেনারেল। আমি চাই কাজ সফল হোক, কে নেতৃত্ব দিল না দিল, তাতে কিছু আসবে যাবে না আমার।'

নিঃশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন বৃদ্ধ। 'গুড। আর কারও কিছু আছে বলার, লেফটেন্যান্ট আতাসী?'

দ্রুত মাথা নাড়ল বেদুইন। 'না, জেনারেল।'

'সার্জেন্ট জুবায়ের?'

'নেই, স্যার।'

'ক্যাপ্টেন আব্বাস?'

'আছে, স্যার।'

'বলো।'

'আপনি বলছেন টার্গেট থেকে একশো বিশ মাইল দক্ষিণে আমাদের কিছু একটা করতে হবে। আমি বুঝতে পারছি না তাতে ফল কি হবে, কিভাবে কাজ উদ্ধার হবে।'

হাসি ফুটল জেনারেলের মুখে। 'আমি ভাবছিলাম প্রশ্নটা এখনও কেউ তুলছে না কেন।' সহকর্মীদের দিকে তাকালেন, তারাও হাসছেন মৃদু মৃদু। উঠে পড়লেন আরাবী, ছড়ি নিয়ে ম্যাপের দিকে এগোলেন, ইসরাইল-লেবানন বর্ডারের ইসরাইল অংশে ছোঁয়ালেন ওটার ডগা। 'এটা একটা পাহাড়, নাম মেইরন। উচ্চতা চার হাজার ফুট। এক সময় লেবাননের ছিল মেইরন, পরে বেদখল হয়ে গেছে। সে যাই হোক, এই অঞ্চলের আর সব গ্লেসিয়ারের মধ্যে মেইরন অন্যতম। মাউন্ট হেরমনের মত আট মাসই বরফে ঢাকা থাকে।'

ওখানটায় ঠুক্-ঠুক্ করে ছড়ি ঠুকলেন জেনারেল। 'এটার পায়ের কাছে বড় এক লেক আছে চারটে স্লুইস গেটওয়ালা। মেইরন ও আশেপাশের আরও কয়েকটা গ্লেসিয়ারের পানি সংরক্ষণ করা হয় এই লেকে। লেকটা যেমন বড়, তেমনি গভীর।'

ছড়ি নামিয়ে নিলেন বৃদ্ধ, যেন আর কিছু বলার নেই, এমন ভঙ্গিতে ফিরে এলেন আসনে। উল্টোদিকের ছয় জোড়া চোখ

অনুসরণ করছে তাঁকে। ঘরে পিন পতন নীরবতা। এক সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলল ক্যাপ্টেন, খানিক উসখুস করে বলল, 'তারপর কি, স্যার?'

প্রচুর সময় নিয়ে সিগারেট ধরালেন জেনারেল, মুখ সামান্য বাঁকা করে এক গাল ধোঁয়া ছাড়লেন ওপরমুখো। 'তারপর?' বলেই আবার চুপ মেরে গেলেন। রানা মনে মনে হাসল বুড়োর নাটুকেপনা দেখে। 'তারপর যা ঘটবে, মানে তোমাদের যা ঘটাতে হবে, সে কথা বলতে গেলে ছোট্ট একটা ইতিহাস বলে নেয়া দরকার আগে। কিন্তু হাতে সময় নেই, এখনই রওনা করতে হবে আমাদের। মেতুলায় গিয়ে জানতে পারবে তোমরা সে ঘটনা।'

'কিন্তু...' শুরু করল আব্বাস, কিন্তু জেনারেলের মুখে চওড়া হাসি ফুটতে দেখে আর এগোতে পারল না।

'অস্থির হয়ো না,' বললেন তিনি। 'ইতিহাস ছাড়া সে কথা বলে ফেললে মজা নষ্ট হয়ে যাবে। তারচেয়ে একটু ধৈর্য ধরো। কেমন?'

হাতঘড়ি দেখলেন আরাবী। 'জেন্টলমেন, সময় হয়ে গেছে। এবার উঠতে হবে আমাদের। আমি আর আল সাউদ যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে।'

একটু পর লেখক সঙ্ঘের অফিস থেকে বেরিয়ে এল সবাই, প্রায় জনশূন্য সড়ক ধরে এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে চলল তিনটে গাড়ি।

পাহাড়ী পথ ধরে গোঁ-গোঁ শব্দে ওপরে উঠছে ছয় কমান্ডোবাহী টয়োটা ট্রাক। ঝোপ-ঝাড় এড়িয়ে আঁকাবাঁকা, এবড়োখেবড়ো সারফেসের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে হেরমনের চূড়োর দিকে চলেছে।

এক সময় দীর্ঘ পাইন বনের মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেল, ছোট হয়ে যেতে লাগল গাছগুলো। দু'হাজার ফুট উঁচুতে এসে ট্রাক থামানোর নির্দেশ দিল মাসুদ রানা। একটানা অনেকক্ষণ ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে ব্যথা হয়ে গেছে পিঠ আর নিতম্ব, একটু হাঁটাচলা করে না নিলে আর চলছে না।

ক্যাব থেকে নেমে পড়ল ও। পিছনে তাকাল। জেনারেল আরাবী ও মেজর জেনারেল আল সাউদের জীপটাকে দেখতে পেল না, অনেক পিছনে পড়ে গেছে ওটা। রানাকেও জীপে আসার জন্যে বলেছিলেন জেনারেল আরাবী, ও রাজি হয়নি। কায়রো থেকেই মিশন শুরু হয়েছে ধরে নিয়েছে রানা। অতএব ওর ধারণা মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত যতদূর সম্ভব সহকর্মীদের সঙ্গে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

তাতে উভয় পক্ষের মধ্যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। এই দূরত্ব মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে কাজের সময়, তাই সে ঝুঁকি নেয়নি রানা।

দু'হাত ভাঁজ করে কাঁধ বরাবর তুলল ও, তারপর কোমরের ওপরের অংশ ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে ব্যায়াম করে নিল কয়েক সেকেন্ড। ওটা সেরে কয়েকবার সামনে-পিছনে করল, সবশেষে বারবিশেক ওঠ-বস করে ক্ষ্যান্ত দিল। নিজের চারদিকে তাকাল। বেশ কিছুটা খোলামেলা জায়গা দেখা গেল ডানদিকে, দলে দলে মেষ চরছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বরফে ছাওয়া ছিল এই এলাকা, তাই ঘাসের রঙ এখনও বাদামী। মনের সুখে সেগুলোই গিলছে ওরা।

পালকরা এক জায়গায় বসে জটলা করছে। গাড়ি থামায় তাকিয়েছে সবাই, কিন্তু কাউকে কৌতূহলী হয়ে উঠতে দেখা গেল না। পথ দুর্গম হলেও এ পথে সব সময় সামরিক যান চলে, তা

ওদের অজানা নয়। পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল রানা।

আতাসী নেমে এসেছে। চোখমুখ ফোলা, ঘুমাচ্ছিল মনে হয়। ওর পিছনে অন্য চার কমান্ডোকেও দেখা গেল।

'এখানে কি, বস্?' বলল আতাসী।

'শরীরের যন্ত্রপাতি সব ঠিকঠাক আছে কি না, চেক্ করতে থেমেছি,' ক্যাবের ড্যাশবোর্ড থেকে শক্তিশালী যেইস আইকন বিনকিউলারটা তুলে নেয়ার ফাঁকে বলল ও।

'ঠিক করেছ। যে রাস্তা, বাপ্‌রে! ভেবেছিলাম একটু গড়িয়ে নেব, তা এত লাফঝাঁপের মধ্যে ফ্লোরে পিঠ ছোঁয়ায় কার বাপের সাধ্য!'

মুচকে হাসল রানা। 'অর্থাৎ ঘুম বসে বসেই সেরেছ?'

'মানে?'

'তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ঘুমে তেমন ব্যাঘাত ঘটেনি, তাই বলছিলাম কাজটা বসেই সেরেছ কি না!'

'ওহ্,' লজ্জা পাওয়া হাসি দিল বেদুইন। 'না, মানে একটু...'

মিশরীয় সার্জেন্ট জুবায়েরের প্রাণখোলা হা-হা হাসি শুনে চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল সে। রানাও। 'কি?' প্রশ্ন করল ও।

হাসি ঠেকাল যুবক। 'লেফটেন্যান্ট এতক্ষণ নাক ডাকাচ্ছিলেন, মেজর।'

'বলেছে তোমাকে!' ফুঁসে উঠল আতাসী। 'ফাজিল ছোঁড়া!' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাকি তিনজনও মুখ টিপে হাসছে দেখে মত পাল্টাল, ব্যস্ততার ভান করে পথের পাশের বড় এক বোল্ডারের আড়ালে চলে গেল তলপেটের চাপ খালাস করতে।

হাসি চেপে সামনে তাকাল রানা, আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা মাউন্ট হেরমনের চূড়োর দিকে নজর দিল। নয় হাজার

ফুটেরও বেশি উঁচু ওটা। নিচের দিকে তামাটে রঙের পাথুরে দেহ বেরিয়ে আছে, ওপরের পুরোটা বরফে ঢাকা। রোদ গায়ে মেখে চিক্ চিক্ করছে। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে তাকাল ও। নিথর, গম্ভীর, ভীতিকর একটা কাঠামো। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে কাল্পনিক আশঙ্কায় বুক কেঁপে ওঠে।

চোখের কোণে অস্পষ্ট একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে সেদিকে ঘুরল রানা। সাদার রাজ্যে কুচকুচে কালো বিন্দুর মত কি যেন উড়ছে। বোঝা যায় না কি পাখি। লেন্স অ্যাডজাস্ট করে বিন্দুগুলোকে স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করল ও, কাজ হলো না। এত দূরে ওগুলো যে কিছুই বোঝা গেল না। বিনকিউলার নামাতে যাচ্ছিল, এই সময় পিছন থেকে কথা বলে উঠল ট্রাক ড্রাইভার, 'ওগুলো চাফ, স্যার। এক ধরনের কাক, লাল পাওয়ালা। পাহাড়ের গর্তে থাকে।'

লোকটাকে দেখল রানা—মাঝবয়সী মানুষ। পাহাড়ী যোদ্ধা। সিরিয়ান স্কুল অভ স্নো অ্যান্ড মাউন্টেন ওঅরফেয়ারের কমান্ড্যান্ট, কর্নেল হাজির অফিশিয়াল গাড়ি চালক। হেরমনের পায়ের কাছের ছোট এক শহর থেকে তুলে এনেছে ওদের।

'তুমি শিওর?'

মাথা দোলাল সে। 'হ্যাঁ, স্যার।'

আবার চোখে দূরবীন লাগাল রানা, হেরমনের দিকে তাকাল। যেদিকে চোখ যায় শুধু পীক আর গ্লেসিয়ার। উঁচু-নিচু, এবড়োখেবড়ো। কোন ছিরিছাঁদ নেই। হেরমনের ওপাশে, পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে ইসরাইলী বর্ডার। পশ্চিমে লেবানন, দক্ষিণে জর্ডান।

দশ মিনিট পর আবার চলতে শুরু করল ট্রাক। ক্রমে উঁচুতে উঠতে লাগল, নিচে ছোট হতে হতে সবুজ কাঠির আকার ধারণ

করল পাইন। সামনে পিছনে আকাশ ছুঁয়ে আছে হেরমনের বরফমোড়া দেহ। সূর্য হেলে পড়েছে চূড়ার ওপাশে, রোদ মেখে কাঁচের মত চিক্-চিক্ করছে বরফ। ঠাণ্ডা বাড়ছে, প্রতি নিঃশ্বাসে বুকে তীক্ষ্ণ ছুরির মত খোঁচা মারছে হিম, বিশুদ্ধ বাতাস। আসন্ন অভিযানের কথা ভেবে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা।

একটানা আরও তিন ঘণ্টা চলার পর, সন্ধের সামান্য আগে ডানের এক অগভীর উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু ঘরবাড়ি দেখাল ড্রাইভার। 'মেতুলা গ্রাম।'

ঠিকমত দেখতে পেল না রানা, তার আগেই ট্রাক বাঁক নিতে আড়ালে পড়ে গেল ওটা। সরু রাস্তা ধরে ঘুরে ঘুরে আরও উপরে উঠছে ট্রাক। 'পৌঁছে গেছি,' অবশেষে ঘোষণা করল নাসের। 'সামনের বাঁকে।'

কিট-রোল থেকে পারকা বের করে পরে নিল মাসুদ রানা, ড্র স্ট্রিং টেনে থুত্‌নির নিচে বেঁধে নিল। ঘাড় ফিরাতেই গ্রামটাকে দেখতে পেল আবার। ওদের ঠিক সামনে, খানিকটা নিচের এক ভ্যালিতে। রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সেদিকে। এখানে গোটা এলাকা বরফে ঢাকা। যেদিকে চোখ যায় কেবল সাদার রাজত্ব দেখল ও। নিচু গিয়ার দিয়ে খুব সাবধানে ঢালু রাস্তায় ট্রাক গড়িয়ে দিল নাসের। খানিকটা এগোতে গোটা গ্রামটাই দেখতে পেল ও। হেমনের চূড়োর কাছের সর্বশেষ গ্রাম–মেতুলা। আর্মি ব্যারাকের চেয়ে গ্রামটা একটু নিচে।

আর্মি ব্যারাক, একটা মসজিদ, একটা কবরস্থান, আর কিছু গ্রাম্য ঘরবাড়ি, এই হচ্ছে এর সম্বল। নিরাপদে ভ্যালিতে নেমে এল ট্রাক, কিছুটা এগিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিতেই বড় এক রঙিন হোর্ডিঙ চোখে পড়ল রানার। ওটায় লেখা : স্কুল অভ স্নো অ্যান্ড মাউন্টেন ওঅরফেয়ার।

ওটা দেখামাত্র শরীর ভেঙে পড়তে চাইল ওর। জেট ল্যাগের ক্লান্তি আর অবসাদ কাহিল করে ফেলল। ঢাকা থেকে কায়রো, সেখান থেকে দামেস্ক, ওখানে সামান্য বিরতির পর ফের সিরিয়ান এয়ার ফোর্সের প্লেনে করে হেরমনের সবচেয়ে কাছের এয়ারবেস কিসউই, গত চব্বিশ ঘণ্টার প্রায় একটানা আকাশ ভ্রমণে বারোটা বেজে গেছে শরীরের। তার সাথে যোগ হয়েছে কয়েক ঘণ্টার ট্রাক সফর–সব মিলিয়ে কাহিল অবস্থা।

কিসউই থেকে এয়ার ফোর্সের কপ্টারে মেতুলা আসার কথা ভাবা হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু পরে সে প্ল্যান বাতিল করে দেয়া হয় বিশেষ কারণে। যে অভিযানে যাচ্ছে ওরা, হেরমনের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও বরফমোড়া দুর্গম পথ তার জন্যে বড় এক বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাই আগেভাগে পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়ার উদ্দেশে রানাই গাড়িতে আসার প্রস্তাব দিয়েছে।

সত্যি সত্যি কাজ হয়েছে তাতে। দলের প্রত্যেকে এর মধ্যে হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছে কিসের মধ্যে কাজ করতে হবে তাদের। মানসিকভাবে বৈরী প্রকৃতিকে মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত এখন সবাই, এবং গাড়িতে আসায় সে প্রস্তুতি নেয়ার পর্যাপ্ত সময়ও পেয়েছে তারা।

মূল ব্যারাক ভবনের সামনে থেমে দাঁড়াল ট্রাক, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট কর্নেল হাজি। মানুষটা মাঝারি উচ্চতার, একটু মোটা, পারকার জন্যে আরও মোটা লাগছে। গালে চাপ দাড়ি। কালো, বড় বড় চোখ। যার দিকে তাকায়, মনে হয় তার ভেতরটাও বুঝি দেখে নেয় এক পলকে। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী মানুষ।

হাসিমুখে রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'গ্ল্যাড টু সী ইউ, মেজর! ওয়েলকাম। আমি ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট, কর্নেল হাজি।'

একটু পিছনে দাঁড়ানো নিজের অ্যাডজুটেন্টকে দেখাল সে। 'এ হচ্ছে ক্যাপ্টেন আরিফ, আমার অ্যাডজুটেন্ট।' হ্যান্ডশেক পর্ব শেষ হতে ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল। 'ভেতরে আসুন, মেজর। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। ইয়ে···আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা চীফ আর মিশনের সুপ্রীম কমান্ড···'

'ওঁরা আসছেন,' রানা বলল। 'একটু পিছনে পড়ে গেছে ওঁদের জীপ।'

'আই সী। আসুন।'

ওদের নিয়ে লম্বাটে এক ঘরে ঢুকল কর্নেল। দুই প্রান্তে বড় দুটো ফায়ার প্লেসে পড়-পড় শব্দে পুড়ছে গাইন, গরম করে রেখেছে ঘর। একটার সামনে পাতা কয়েকটা চেয়ার দেখাল কর্নেল, রানার উদ্দেশে বলল, 'বসে একটু গরম হয়ে নিন। আমি আপনাদের চায়ের ব্যবস্থা দেখে আসি। আরিফ, এঁদের লাগেজ ব্যারাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।'

'ইয়েস, স্যার।'

লোক দুটো বেরিয়ে যেতে পারকা খুলে ফেলল রানা, বসে পড়ল হাত পা ছড়িয়ে। অন্যরাও বসল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কয়েক ঘণ্টা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে কাটিয়ে হঠাৎ পাওয়া উষ্ণ পরিবেশে ঘুমে চোখ বুজে আসতে চাইল সবার। প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল রানা, মানুষের গলা ও কাটলারিজের টুং-টাং শব্দে অনেক কষ্টে চোখ মেলল।

দেখল সামনেই কর্নেল হাজির সঙ্গে কথা বলছেন জেনারেল আরাবী ও মেজর জেনারেল (অব·) আল সাউদ। কাছেই একটা ফোল্ডিং টেবিল পেতে তার ওপর খাবার সাজাচ্ছে ব্যস্ত তিন মেসবয়।

'হ্যালো, রানা,' ওকে সোজা হয়ে বসতে দেখে এগিয়ে এলেন

আরাবী। 'তোমাদের ঘুমাবার আয়োজন সেরে ফেলা হয়েছে। এসো, খেয়েদেয়ে ঘুম দাও, বাকি কাজ কাল সকালে সারা যাবে। আমরাও খুব ক্লান্ত, কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে না নিলে আর পারা যাচ্ছে না।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে ঘরে ঢুকল খাটোমত এক লোক। বয়স্ক। পোড় খাওয়া চেহারা, থুত্‌নির কাছে বেশ কিছু পক্সের দাগ। ফার জ্যাকেট পরে আছে লোকটা, ইয়ার ফ্ল্যাপ খোলা বলে মুখের পুরোটাই বেরিয়ে আছে। অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশে হাত তুলে সালাম জানাল লোকটা বিড়বিড় করে।

'এ হচ্ছে নাগিব,' ঘোষণা করল কর্নেল হাজি। 'ডুমস্‌ডের সদস্যদের রুট ম্যাপ ওরই তৈরি,' রানার দিকে ফিরল। 'স্থানীয়, মেষপালক। এবং আমাদের মহামূল্যবান ইনফর্মারও।'

জেনারেল আরাবীর দিকে তাকাল রানা। অর্থটা বুঝলেন তিনি, কাছে এসে নিচু গলায় বললেন, 'এর কথা আল সাউদ বলেছেন আমাকে। সিরিয়ান আর্মির জন্যে তথ্য আদান-প্রদান করে। বিশ্বস্ত। ওকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।'

মাথা দোলাল ও।

তিন

এক ঘুমে রাত কাবার করে খুব ভোরে উঠল মাসুদ রানা। বাইরে ফরসা হয়ে আসছে দেখে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। অন্যরা সবাই

মড়ার মত অনড়, কয়েকজন নাক ডাকাচ্ছে।

এটা একটা ব্যারাক, সাত নম্বর 'হাট'। কমান্ডো মিশনের সদস্যদের জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এটায় যারা থাকত, মিশন স্কুল ত্যাগ না করা পর্যন্ত নয় নম্বর ঘরে থাকবে তারা।

ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভু নিভু হয়ে এসেছে, তবু ঘর যথেষ্ট গরম এখনও। পারকা গায়ে চাপিয়ে দূরবীনটা নিয়ে বেরিয়ে এল ও। কাল সন্ধের সময় পৌঁছেছে, জায়গাটা ভাল করে দেখার সুযোগ হয়নি, ঘাটতিটা পুষিয়ে নিতে চায় এখন।

হাটের খোলা বারান্দায় পা রাখতেই হিম বাতাসের ঝাপ্টা এসে লাগল ওর নাকেমুখে। খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। চারদিকে সাদার বিস্তৃতি। পুরু হয়ে জমে আছে বরফ। মে মাস সবে শুরু হয়েছে। নিচের দিকের বরফ গলতে শুরু করলেও এদিকে গলতে গলতে সেই আগস্ট মাস। হালকা কুয়াশার পর্দা ভেদ করে নিচের অবস্থা দেখার চেষ্টা করল ও। কিছুই দেখা গেল না। তবে কুলকুল আওয়াজ শুনতে পেল অস্পষ্ট।

অনেক নিচে কোথাও বরফ গলছে, বয়ে চলেছে ঝর্ণা হয়ে। কোন দিকে কে জানে! পায়ে পায়ে ব্যারাকের পিছনে চলে এল ও, মেতুলা দেখতে পেল স্পষ্ট। ছোট ছোট লোকজন দেখতে পেল, ভেড়ার পাল নিয়ে ঘর ছাড়ছে। মসজিদ থেকে দু'একজন মুসল্লীকে বেরোতে দেখল, ধীর পায়ে যে যার বাড়ির দিকে চলেছে।

একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন শুনে ঘুরে তাকাল রানা। দেখল একটা ট্রাক্টর বরফ সরিয়ে ব্যারাকের রাস্তা পরিষ্কার করছে। ব্যারাকের এক মাথায় শেডের নিচে আরও কয়েকটা স্নো ট্রাক্টর দেখা গেল। ধীরে ধীরে জ্যান্ত হয়ে উঠল ব্যারাক, ট্রেইনীরা বেরিয়ে আসতে লাগল ব্যারাক ছেড়ে। একটু পর সূর্য উঠল।

চূড়োর বরফ তার ফ্যাকাসে আলো গায়ে মেখে নীলচে সবুজ

আলোর ছটা ছড়াতে শুরু করল আকাশে। কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা। একটু পর নতুন ধরনের এক যান্ত্রিক আওয়াজ কানে এল। ওটা আরেকটা ট্রাক্টর, সামনের দিকটা বেজির মুখের মত দেখতে। তুষারমোড়া পথ বেয়ে নিচের দিকে যাচ্ছে ওটা, সামনে বাঁধা আছে একটা ইকুইপমেন্ট স্লেজ। ওগুলোর সঙ্গে স্কি চড়ে যাচ্ছে একদল সৈনিক। রাইফেল ঝুলছে সবার কাঁধে, নল আকাশের দিকে খাড়া।

খানিকটা নেমে রাস্তা ছেড়ে টালু, প্রায় সমতল এক মাঠে নেমে গেল দলটা, ইংরেজি ভি-র মত নিখুঁত আকৃতি নিয়ে গ্রাম সোজা নামতে শুরু করল স্কি করে। সারফেসের তুলোর মত নরম তুষারে ঢেউ তুলে দ্রুত নেমে যাচ্ছে দলটা, ক্রমে ছোট হয়ে আসছে মানুষগুলো। দূর থেকে আকৃতিটাকে লাগছে তীরের উল্টো মাথার মত, পিছলে নেমে যাচ্ছে যেন।

'খুব সম্ভব এক্সারসাইজে যাচ্ছে ওরা, রানা ভাবল। মাউন্টেন ওঅরফেয়ারের ট্রেনিঙে। ঘরে ফিরে চলল ও। সূর্যের তেজ নেই, বরং আরও ফ্যাকাসে লাগছে আলো। ঠাণ্ডা বাড়ছে। ওর নিঃশ্বাস ধোঁয়ার সৃষ্টি করছে মুখের সামনে। ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। ছয়টা বেড আছে হাট সাতে, আর আছে তিনটে বড় ক্লোদস লকার, একটা বড় ফায়ারপ্লেস; তার পাশে স্তূপ করা আছে জ্বালানী কাঠ, একটা ওয়াশ বেসিন ও প্লাস্টিক কার্টেনঘেরা একটা শাওয়ার। একটা কাবার্ডও আছে।

ওর সাড়া পেয়ে সার্জেন্ট জুবায়েরের ঘুম ভাঙল প্রথমে, তারপর একে একে অন্যরাও জেগে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে ব্যারাক মেসে প্রায় রাজকীয় নাস্তা খেল ওরা জেনারেল আরাবী, মেজর জেনারেল (অব.) আল সাউদ এবং কর্নেল ও ক্যাপ্টেনের সাথে। তারপর ঠিক ন'টায় মিলিত হলো কর্নেলের

অফিসে।

রুমটা মোটামুটি বড়। কর্নেলের চেয়ার-টেবিল সরিয়ে সামনের দিকে জায়গা করা হয়েছে বেশ খানিকটা। এক মাথায় দুটো নিচু টেবিলে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা আছে কিছু, জায়গায় জায়গায় উঁচু হয়ে আছে ত্রিপল। আরেক মাথায় দশটা চেয়ার পাতা দুই সারিতে। ওগুলোর পিছনে একটা প্রজেক্টর দাঁড়িয়ে আছে রুমের অন্যমাথার দেয়ালের দিকে মুখ করে। সিলিঙে চারটে নগ্ন বালব্ আলো ছড়াচ্ছে। রুমের ঠিক মাঝখানে, পিছনদেয়াল ঘেঁষে আছে বড়সড় এক ফায়ারপ্লেস, পর্যাপ্ত তাপ ছড়াচ্ছে ওটা।

'পারকা খুলে আরাম করে বসুন সবাই,' বলল কর্নেল হাজি। 'এখানে ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনা নেই।'

নীরবে তাই করল প্রত্যেকে। সামনের সারিতে সিরিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান ও জেনারেল আরাবীর সাথে বসল মাসুদ রানা, অন্যরা পিছনের সারিতে। কর্নেল ও তার অ্যাডজুটেন্ট তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল, ত্রিপল ঢাকা টেবিলের দিকে পিছন ফিরে। দরজায় নকের শব্দ উঠল এই সময়, ক্যাপ্টেন আরিফ এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল দরজা। ভেতরে ঢুকল নাগিব। তার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। 'বসে পড়ো।'

একটা চেয়ার খানিকটা সরিয়ে নিয়ে বসল লোকটা, তার আগে সামনের সারির উপবিষ্টদের উদ্দেশে হাত তুলে নীরব সালাম জানাতে ভুলল না। দরজা লাগিয়ে জায়গায় ফিরে গেল আরিফ। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল কর্নেল হাজি।

'ডুমসডে মিশনের সদস্যদের উদ্দেশে কিছু বলে নিতে চাই আমি আসল কাজে হাত দেয়ার আগে। এবং কথাগুলো সিরিয়া, জর্ডান, মিশর, লেবানন ও পিএলও-র অফিশিয়াল প্রতিনিধি হিসেবে বলব আমি।' থামল হাজি, অন্তর্ভেদী চোখে এক এক

করে দেখে নিল ছয় সদস্যকে। 'কথাগুলো গৎবাঁধা, তবু কেউ হালকাভাবে নেবেন না বলেই আশা করব আমি।'

'এখানে আসন্ন মিশনের যিনি নেতা, তিনি আমাদের বন্ধু প্রতিম এক দেশের নাগরিক, অতীতে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলো বিপদে-আপদে বহুবার তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে ধন্য হয়েছে। তাঁর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে আমি তাঁকেও অনুরোধ করব আমার বক্তব্য মন দিয়ে শুনতে। তাঁর এবং লেফটেন্যান্ট আতাসীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টা সর্বোচ্চ মহল থেকে অনুমোদিত হয়ে এসেছে, অতএব সে প্রসঙ্গে আমার কিছু বলার নেই। তবে অন্য যাঁরা আছেন, তাদের উদ্দেশে আছে। আপনারা চারজন তিন আরব দেশের নিয়মিত সৈনিক।

'এই অঞ্চলের স্বার্থের কথা ভেবে আপনাদের এ কাজে ডাকা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনারা মিশনে অংশ নিতে বাধ্য। আপনাদের সার্ভিস কন্ট্রাক্টে এমন কোন শর্ত নেই যে যে দেশের সাথে আমরা যুদ্ধে জড়িত নই, সে দেশের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কোন কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে ডাকা হলেই আপনারা তা করতে বাধ্য।

'যে মিশনে আপনারা যাচ্ছেন, সেটা এক কথায় ভয়ঙ্কর। প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। খুবই ক্ষীণ। কেউ যদি নীতিগত, ব্যক্তিগত বা রাজনীতিগত কারণে মনে করেন এ মিশনে অংশ নেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে নির্দ্বিধায় বলে ফেলুন। তাঁকে রেখে অন্য কাউকে অন্তর্ভুক্ত করব আমরা। পাঁচ মিনিট সময় দেয়া গেল, যার আপত্তি আছে, এরমধ্যে বলতে হবে।'

'একটা প্রশ্ন করতে পারি?' সাদিক মাহের বলে উঠল। তার আগে আল সাউদ ও জেনারেল আরাবীকে দেখে নিল এক পলক।

কর্নেল মাথা ঝাঁকাল। 'নিশ্চয়ই!'

'আমি শুনেছি যে মিশনে যেতে আপত্তি করবে, তাকে তার কর্তৃপক্ষের হাতে কোর্ট মার্শালের জন্যে তুলে দেয়া হবে। অথচ আপনি বলছেন...'

মৃদু হাসি ফুটল কমান্ড্যান্টের মুখে। 'আগে যা শুনেছেন, সেটাও সত্যি। এবং এখন যা শুনলেন, সেটাও। প্রথমে সেরকম সিদ্ধান্তই নিয়েছিল হাই কমান্ড, কিন্তু গতরাতে আলোচনা করে তা পাল্টানো হয়েছে, মিশন সদস্যদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে।' ডান হাতের পাঁচ আঙুল দেখাল কর্নেল। 'পাঁচ মিনিট।'

ঘুরে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল সে। ক্যাপ্টেন আরিফ প্রজেক্টর ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নীরবে কেটে যেতে লাগল সময়। ঠিক তিনশো সেকেন্ড পর আসন ছাড়ল কর্নেল। 'কারও আপত্তি আছে?'

কেউ সাড়া দিল না। একচুল নড়ল না পর্যন্ত।

'অল রাইট। এবার তাহলে আসল কাজে হাত দেয়া যেতে পারে। মিশনে গিয়ে কি করতে হবে, সে সম্পর্কে আগেই শুনেছেন আপনারা, ফাইনাল ব্রীফিঙের সময় আরও একবার শুনতে পাবেন, কাজেই এখন সে প্রসঙ্গ বাদ। এখন একটা গল্প শোনানো হবে আপনাদের। গল্প মানে ঠিক গল্প নয়, ইতিহাস। ডুমসডে মিশনের পরিকল্পনা যাঁর উর্বর মাথা থেকে বেরিয়েছে; মিশন-নেতা মেজর মাসুদ রানার বস্, মেজর জেনারেল রাহাত খান, তাঁর মুখে ঘটনাটা শুনে এসেছেন জেনারেল আরাবী। আপনাদের উদ্বুদ্ধ করতে কাহিনীটা ভাল অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

'ঘটনাটা ১৮৯৪ সালের, অর্থাৎ, প্রায় একশো বছর আগের। ভারত ও কাশ্মীরের বর্ডারে, হিমালয়ের অনেক উঁচুতে একটা ঢালু

উপত্যকা আছে, জায়গার নাম নন্দকনা। ওটা হিমালয় রেঞ্জের যে পাহাড়ে, তার চূড়ার নাম ত্রিশূল। ত্রিশূল গ্লেসিয়ার। উপত্যকার নাম ঘোনা। এই ত্রিশূলের বরফগলা পানি ঘোলা হয়ে নিচে নেমে সৃষ্টি করেছে এক নদীর, বিরহী গঙ্গা তার নাম।

'৯৪ সালে হঠাৎ করে একদিন ভূমিকম্পে ত্রিশূল ভেঙে পড়ল, বাড়ির মত বড় বড় একেকটা পাথর তার প্রাকৃতিক আশ্রয় ছেড়ে ছিট্‌কে পড়ল, আকাশ ঢাকা পড়ে গেল ধুলোয়। একটানা তিনদিন ধরে চলল ভূমিকম্প, কম করেও বারো মিলিয়ন কিউবিক ফুট পাথর খসে পড়ে ঘোনা উপত্যকার চলাচলের পথ বুজিয়ে দিল। বিরহী গঙ্গা? হাজার ফুট পাথর ও ধ্বংসাবশেষের ওপাশে আড়াল হয়ে গেল।'

দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল কর্নেল হাজি, ট্রাউজারের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। 'ঘোনা ভ্যালি হয়ে গেল ঘোনা লেক। বর্ষাকালে কয়েক মাসের প্রবল বর্ষণে পানি জমল লেকে, জমতে জমতে লেকের বিস্তৃতি তিন মাইল বেড়ে গেল। বাড়তেই থাকল যতক্ষণ না পাথরের বাধার কিনারা পর্যন্ত উঠল পানি।

'তারপর,' থেমে সিগারেটে কষে টান লাগাল কর্নেল। 'তারপর, '৯৪ সালের ২৫ আগস্ট মাঝরাতের একটু পর, ওভারফ্লো করল লেক। প্রথমে সরু স্রোতে পাথরের ফাঁক গলে বেরোতে শুরু করল পানি, তারপর হঠাৎ করে ভেঙে পড়ল বাঁধ। ছাড়া পেয়ে গেল বাঁধের কয়েক মাস ধরে জমা পানি। ভরা বেসিন হঠাৎ ভেঙে পেলে যে অবস্থা হয়, ওখানেও তাই হলো। তিনশো ফুট গভীর লেক ভয়ঙ্কর গর্জনের সাথে বিরহী গঙ্গা হয়ে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে ছুটে চলল নিচের দিকে, অলকনন্দা উপত্যকার দিকে।

'ব্যাপারটা কল্পনা করুন। অন্ধকারে নিশ্চয়ই দানবীয় শক্তির ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের মত ছুটছিল পানি। যাওয়ার পথে কিচ্ছু রাখেনি। রাস্তা, ব্রিজ, দালান-কোঠা, মানুষ, পশু, সব শোলার মত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। একসময় কাশ্মীরের ভারত নিয়ন্ত্রিত অংশের রাজধানী শ্রীনগরে পৌঁছল বন্যার পানি।' একটু বিরতি দিল কর্নেল, কাঁধ ঝাঁকাল, 'সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল শহরটা।'

আবার কিছু সময় চুপ করে অনড় দাঁড়িয়ে থাকল সে। একে একে সবাইকে দেখল, তারপর নড়ে উঠল। সিগারেট মেঝেতে ফেলে বুট দিয়ে পিষে অ্যাডজুটেন্টের দিকে তাকাল। 'এক রাউন্ড চায়ের কথা বলে এসো, আরিফ।'

দশ মিনিট পর চা-সিগারেট পর্ব সেরে ফের উঠে পড়ল কর্নেল হাজি। 'একশো বছর পর আজ সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে। হিমালয়ের ওটা ঘটেছে প্রাকৃতিক কারণে, এটা ঘটবে মানবিক কারণে। আপনারা ঘটাবেন। ক্যাপ্টেন, হেল্‌প্ মি।'

দু'জনে প্রথম টেবিলের ত্রিপলের দুই প্রান্ত ধরে তুলে ফেলল, বেরিয়ে পড়ল ঢেকে রাখা জিনিসটা। মেইরন পাহাড়ের মিনিয়েচার মডেল। ত্রিপলটা মেঝেতে ফেলে রানার দিকে তাকাল হাজি। 'মেজর আসুন, প্লীজ! আপনারাও আসুন।' নিজের ডেস্কের ওপর রাখা একটা সাদা পয়েন্টার তুলে নিল সে, কাঁধের ওপর রাইফেলের মত শুইয়ে রাখল সেটা।

এদিকে মডেল ঘিরে দাঁড়িয়েছে সবাই, জেনারেল আরাবী এবং আল সাউদও। সমালোচকের দৃষ্টিতে ওটা দেখল রানা। মানতেই হলো, চমৎকার! মেইরন পাহাড় না দেখেও ওর মনে হলো প্রতিকৃতিটা নিখুঁত হয়েছে। যেখানে যে রঙ প্রয়োজন, খুব যত্নের সাথে তাই লাগানো হয়েছে। ওটার দক্ষিণ প্রান্তে তীক্ষ্ণ দাঁতের মত ওপরমুখো কিছু আইস ক্যাপ দেখল ও, তার মধ্যে দিয়ে গেছে

একটা গভীর গিরিপথ।

পাহাড় সারির মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়ে একটা গ্লেসিয়ারের চওড়া বুকে গিয়ে মিশেছে ওটা। গ্লেসিয়ারটা প্রায় খাড়া নেমে গিয়ে গোড়ার কাছে ভাঙা আইসফলে পরিণত হয়েছে। সেখান থেকে শুরু হয়েছে স্নো ফিল্ড। তার মাঝে এখানে-সেখানে আছে কনিফারের ঘন বন। গাঢ় সবুজ পিগমেন্ট দিয়ে স্নো লাইনের সমাপ্তি দেখানো হয়েছে মডেলে। তার ওপাশে চওড়া এক বেসিন, পরিষ্কার পানি টলটল করছে ওর মধ্যে। ওটাই সেই লেক।

ওর ওপর নজর থমকে গেল রানার। লেকের ওপাশে খাড়া উঠে গেছে একটা পাথুরে পাহাড়ের চূড়া। ওপরটা এবড়োখেবড়ো নয়, বরং অনেকটা সমতলই বলা চলে। সব মিলিয়ে দেখতে মানুষের মুখের মত ওটা, যেন পাথরের তৈরি কোন দানবাকৃতির মানুষ চোখ কুঁচকে লেকের পানিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে।

মেঝে থেকে ছোট এক খণ্ড কাঁকর তুলে নিল হাজি, হাত উঁচু করে ছেড়ে দিল লেকে। মৃদু আলোড়ন উঠল পানিতে, ছোট ছোট ঢেউ উঠল। নাচতে নাচতে গিয়ে আঘাত করল লেক সীল করে রাখা বাঁধের গায়ে। লেকের সামান্য দূরে, বেশ উঁচু, গাঢ় খয়েরী রঙের কয়েকটা কাঁধের মত পাহাড় চুড়ো দেখল রানা, তার মধ্যে দুটো বেশ উঁচু। ওরই ভিতর দিয়ে গেছে গিরিখাত, একটা নদী বইছে ওখানে। এঁকেবেঁকে অনেক দূর চলে গেছে নদী। তারপর আচমকা গিয়ে মিশেছে এক সমতল ভূমিতে। ঠিক নদী আর সমতল ভূমির মিলিত হওয়ার জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে বড়সড় এক কমপ্লেক্স—যাফাত রকেট লঞ্চিং প্ল্যান্ট।

ওখানকার খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দেয়নি মডেলার। প্ল্যান্টের ফ্যাক্টরি ইনস্টলেশন, ট্রান্সফরমার, টারবাইন শেড, চিমনিসহ পাওয়ার স্টেশন, করাতের দাঁতের মত ছাতওয়ালা ডজনখানেক

ফ্যাক্টরি, গ্যানট্রি, রিজার্ভয়ের রেলওয়ে ট্র্যাক ও রোলিং স্ট্যাক রাস্তা, এয়ারফিল্ড, কন্ট্রোল টাওয়ার, কর্মচারীদের কলোনি, কিছু বাদ রাখেনি। ধোঁয়া বোঝাতে পাওয়ার স্টেশনের চিমনির মাথায় খানিকটা কটন উলও জুড়ে দিয়েছে। একেবারে বস্তুনিষ্ঠ একটা মডেল।

আপনমনে মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'দারুণ হাতের কাজ।'

'থ্যাঙ্কস,' হাজি বলল। 'সময় পেলে হয়তো আরও সুন্দরভাবে তৈরি করা যেত জিনিসটা। আটচল্লিশ ঘণ্টারও কম সময়ে এটা তৈরি করা হয়েছে। ইউ নো, এই প্ল্যান্টের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে, শুনেছি, গত কয়েক মাস ধরে বহু মাথা খাটিয়েও প্রশ্নটার কোন সুরাহা করা সম্ভব হয়নি। সেটা হয়েছে মাত্র কয়েক দিন আগে, ঢাকায়। মেজর জেনারেল রাহাত খানের প্ল্যান ও তাঁর হিমালয়ের সেই ইতিহাস শুনেই করণীয় ঠিক করে ফেলেন জেনারেল আরাবী, যোগাযোগ করেন আমাদের ইন্টেলিজেন্স সংস্থার চীফের সঙ্গে। তারপর,' থেমে শ্রাগ করল কর্নেল।

'প্ল্যান তাঁরও পছন্দ হলো, এক ঘণ্টার মধ্যে গ্রীন সিগন্যাল পেলাম আমি, তারপর...' আবার থেমে গেল সে। সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত ভরে দিল।

বিস্ময় মাখানো প্রশংসার দৃষ্টিতে মডেল দেখছেন আরাবী ও আল সাউদ, কথা নেই কারও মুখে। পয়েন্টার বগলে চেপে ধরে সিগারেট ধরাল কর্নেল, তারপর ওটার ডগা ছোঁয়াল লাল রঙে আঁকা এক ল্যাটিচিউড ডিগ্রীর ওপর। 'এই হচ্ছে ফ্রন্টিয়ার, আমাদের এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে,' বলল সে রানার উদ্দেশে।

আইসক্যাপের ওপর দিয়ে দক্ষিণে নামিয়ে আনল ওটা। 'এই অলটিচিউডে বাউন্ডারির কোন মার্কিং নেই, তবে আমাদের

সুবিধের জন্যে নাগিবকে দিয়ে কাজটা করিয়ে রেখেছি আমি। সঠিক জায়গায় বরফে ডাই ঢেলে ফ্রন্টিয়ার চিহ্নিত করে রেখে এসেছে সে, গেলেই দেখতে পাবেন।'

কয়েক জোড়া চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি ছোটখাট লোকটার ওপর নিবদ্ধ হলো, বিনয়ে গলে গেল নাগিব, নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকল।

'এই লাইন অতিক্রম করলেই ইসরাইল। সীমান্তের আট মাইল ভেতরে এই মেইরন পাহাড়। যাফাত তার একশো বিশ মাইল দক্ষিণে। এখানে,' পয়েন্টার স্থির হলো কমপ্লেক্সের ওপর। 'এটাই সেই মেজর নিউক্লিয়ার রকেট প্ল্যান্ট। বিশাল কর্মকাণ্ড চলেছে এখানে। ইট ইজ আ সিটি অভ সায়েন্স, অ্যান্ড আরসেনাল। এর পাওয়ার প্ল্যান্ট চলে এই লেকে ধরে রাখা মেইরন গ্লেসিয়ারের পানিতে। ওটার নাম জায়ন লেক। এই প্ল্যান্টে প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী কাজ করে। নিরাপত্তার জন্যে মোতায়েন আছে এক রেজিমেন্ট সৈন্য, দুই স্কোয়াড্রন ফাইটার। ইন ফ্যাক্ট, যাফাত প্ল্যান্ট হচ্ছে সুপ্রিম মিলিটারি ইম্পর্ট্যান্ট টার্গেট।'

একটু বিরতি দিয়ে আবার শুরু করল কর্নেল, 'এই যে জায়ন লেক, হিমালয়ের সেই ঘোনা লেকের চেয়েও বড়, গভীর ও উঁচু। আর এই গিরিখাত,' পয়েন্টার তাক করল সে কাঁধের মত পাহাড় চূড়োর ফাঁকে, 'বিরহী গঙ্গার চেয়ে অনেক, অনেক গভীর। গিরিখাতের দেয়াল অলকানন্দা গিরিখাতের চেয়ে অনেক উঁচু, সরু।'

গলা খাদে নেমে গেল কর্নেলের। 'একবার এর বাঁধ ভাঙলে ফ্লাড হবে কম্প্রেস্ড্। ভরা সরু বোতলের মুখ দিয়ে হড়হড় করে পানি বের হওয়ার মত। কম করেও চল্লিশ মাইল বেগে যাফাতের

দিকে ছুটবে লেকের সমস্ত পানি। এবং তার ঠিক পাঁচ ঘণ্টা পর যাফাত প্ল্যান্টের সমস্ত চিহ্ন মুছে যাবে মাটির বুক থেকে। কিছু থাকবে না।'

'বুঝলাম,' মিশরীয় জুবায়ের পাশা বলে উঠল। দীর্ঘদেহী, পেশীবহুল যুবক, তেইশ-চব্বিশের মত বয়স। 'ওই বাঁধ ধ্বংস করতে হবে আমাদের।'

'না,' মাথা নাড়ল হাজি। 'করতে হবে আরও নাটকীয় কিছু। মেইরন পাহাড়ের মানুষের মাথার মত চুড়োটা উড়িয়ে দিতে হবে, বাকি কাজ ওটাই সারবে।' পয়েন্টার রেখে দিল সে। 'আপনারা বসুন, প্লীজ!'

যে যার আসনে বসে পড়ল সবাই। ক্যাপ্টেন আরিফ এগিয়ে গেল প্রোজেক্টরের দিকে। একটা সবুজ মেটাল বক্স থেকে কিছু ক্যাসেট বের করে রুমের আলো নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে তার নড়াচড়ার আওয়াজ শুনতে পেল প্রত্যেকে। কয়েক মুহূর্ত পর প্রোজেক্টরের চাপা গুঞ্জন শোনা গেল, অন্য প্রান্তের ধপধপে সাদা চুনকাম করা দেয়ালে চৌকো, রূপালী আলো ফুটল।

প্রথমে কিছু লাল সংখ্যা ফুটল পর্দায়, তারপর প্রকৃতির চলমান ছবি। ওপর থেকে তোলা, ক্রমে এগিয়ে আসছে, তারপর পর্দার নিচের প্রান্ত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। রানার মনে হলো যেন এই মুহূর্তে আকাশ থেকে নিজের চোখে দেখছে ও দৃশ্যগুলো। অন্য দর্শকদেরও তাই মনে হলো।

'এ ছবি আকাশ থেকে তোলা,' ক্যাপ্টেনের গলা ভেসে এল। "গত পরশু কপ্টারে চড়ে ক্যাম্প থেকে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে যাওয়ার সময় তুলেছি আমরা। মডেলে যে ছোট, হাই-অলটিচিউড ভ্যালি দেখেছেন আপনারা, সেদিকে যাচ্ছি এখন।'

এক মিনিট পেরিয়ে গেল, ছবি চলছে। পাহাড়, বন, বরফগলা

ঘোলাটে পানির স্রোতের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে কপ্টার। পর্দার ডানদিকে সূর্যের আলোর সাদা ঝলক ফুটেই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। রানা বুঝল কোর্স বদলে ঘুরে গেছে কপ্টার। পরক্ষণে ওর ভাবনা প্রতিধ্বনিত হলো ক্যাপ্টেনের গলায়। 'কোর্স চেঞ্জ করেছি আমরা, উপত্যকার দিকে যাচ্ছি এখন। এই উপত্যকা পেরিয়ে জায়ন পাহাড়ে পৌঁছতে হবে আপনাদের।'

বরফ মোড়া এক পাহাড়ের চূড়ো ফুটল, এগিয়ে আসছে গতির সাথে তাল রেখে। ওখানে একটা পাস দেখতে পেল সবাই। 'পাহাড়টা গুরুত্বহীন, কোন নাম নেই। ওটার হাঁটুর কাছে রেখার মত যে পাসটা দেখা যাচ্ছে, ওটা আসলে পাথরের ফাটল, পাস নয়। ওটারও কোন নাম নেই। ওই পথে যেতে হবে আপনাদেরকে।'

একটু পর আরেক পাহাড় দেখা গেল। 'ওটা সিনথি গ্লেসিয়ার। এরমধ্যে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এসে পড়েছি আমরা, এখান থেকে ইসরাইলী বর্ডার মাত্র পাঁচ মাইল দূরে।'

আরও কয়েক সেকেন্ড চলল ছবি, আলো কমে আসছে। আচমকা কালো হয়ে গেল দেয়াল। 'সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সেই সাথে ছবিও শেষ। ইসরাইলী বর্ডারের এক মাইলের মধ্যে পৌঁছে ফিরে এসেছি আমরা। আর যাওয়া ঠিক হত না।' আবার গুঞ্জন করে উঠল প্রোজেক্টর। 'এখন কিছু স্টিল ছবি দেখাব আমি,' বলল সে। 'মেইরন পাহাড়ের আশেপাশের ছবি সবগুলো। যে এসব তুলেছে, আপনাদের মাঝেই রয়েছে সে।'

পাশে তাকাল মাসুদ রানা। তখনই পর্দায় ফুটল প্রথম স্টিল, তার আলোয় লোকটার মুখের এপাশের অংশ চকচক করে উঠল। চোয়াল নড়ছে, কি যেন চিবাচ্ছে নাগিব।

'এটা এক আইসফল, তুলযুক ভয়ঙ্কর জায়গা।'

বিশাল একেকটা বরফের চাঁই অনবরত ওখানটায় আছড়ে পড়ছে দেখল রানা। ওগুলোর সাথে ভয়াবহ সংঘর্ষে নিচের সারফেসের নরম তুষার ধোঁয়ার মেঘের মত লাফিয়ে উঠছে শূন্যে। দেখে মনে হয় বিক্ষুব্ধ সাগরের ঢেউ। আরেকটা ছবি ফুটতে দৈত্যাকার কয়েকটা রিজ দেখতে পেল ও। শক্ত বরফ জমাট বেঁধে নীলচে ইস্পাতের মত ঝুলে আছে ওখানে, পড়ে পড়ে অবস্থা।

'দিনে প্রায় সারাক্ষণই বরফ ধস হয় এখানে, এত বিপজ্জনক জায়গা যে ইসরাইলী সৈন্যরা ওর ধারেকাছেও যায় না,' মৃদু হাসল আরিফ। 'ডুমসডে মিশন সদস্যদের জন্যে এ-ও একটা অ্যাডভান্টেজ।'

এরপর কয়েকটা স্টিলে শুধুই বরফমোড়া উঁচু-নিচু প্রান্তর দেখতে পেল রানা। মাইলের পর মাইল মসৃণ বরফের চাতাল। 'তুলযুক গ্লেসিয়ার থেকে এই পথে মাত্র সতেরো মাইলের ডাউন হিল রান, এই আইসফল পার হতে হবে অবশ্য। ব্যস্, তারপরই ফ্রন্টিয়ার। এবার টার্গেটের ছবি দেখুন।'

নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা। সিগারেট ধরাল। প্রথম স্টিলে ফ্যাকাসে সবুজ রঙের বিশাল এক সমতল শীট দেখল ও, অবশ্য পরক্ষণে বুঝল ওটা শীট নয়, জায়ন লেক। পানি একদম স্থির। নিষ্কম্প। লেকের ওপারে মানুষমুখো মেইরন পাহাড়ের একাংশ দেখা যায়। বাঁয়ে দেখা যাচ্ছে গিরিখাতের মুখ। বাঁধের দেয়াল ওটার মুখ সীল করে রেখেছে। চারটে স্লুইস গেট দেখা যাচ্ছে বাঁধে। এক মাথায় কংক্রিটের গার্ড টাওয়ার।

'লেকঘেঁষা এই পাহাড় সাগরপিঠ থেকে দশ হাজার ফুট উঁচুতে, লেক চার হাজার ফুট। তিন হাজার ফুট উঠতে হবে আপনাদের মেইরনের মাথা খসাতে।'

মুগ্ধ চোখে প্রকৃতির অদ্ভুত, খেয়ালী সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে

থাকল রানা। মডেলে যেমন আছে, ঠিক তেমনি দেখতে পাহাড়টার চূড়ো। দুটো ভুরু, স্ল্যাবের তৈরি প্রায় খাড়া নাক, তার গোড়ায় ছোট দুই গর্ত হচ্ছে নাকের ফুটো। আরও নিচে পরপর দুটো ঠেলে বেরিয়ে থাকা শেলফ দেখলে ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের মতই লাগে। ভুরু কুঁচকে মাথা নিচু করে লেকের দিকে তাকিয়ে আছে মেইরন।

'এবার আসল ছবি দেখাও,' বলে উঠল কর্নেল হাজি।

নীরবে স্টিল বদল করল আরিফ। প্রথম কয়েক মুহূর্ত রানা বুঝতে পারল না ওটা কিসের, বুঝল একটু পর। ক্যাপ্টেনের বক্তব্য সমর্থন জোগাল। 'এটা হচ্ছে মেইরনের মাথার পিছনের ছবি, ঘাড়ের। এটা অনেক পুরনো ছবি, এক সময় যখন ওটা লেবাননের ছিল, তখনকার তোলা। ভাল করে দেখুন।'

হাজি উঠে পড়ল পয়েন্টার নিয়ে। ওটার ডগা ছোঁয়াল দেয়ালে, ঘাড়ের ওপর। 'এই যে আড়াআড়ি কালো একটা দাগ দেখতে পাচ্ছেন,' বলল সে। 'এটা আসলে দাগ নয়, পাথরের ফাটল। ম্যাসিভ এক জিওলজিক্যাল ফল্ট। লাইট্স্, প্লীজ!'

দেয়ালের ছবি অদৃশ্য হয়ে গেল, প্রায় একই সঙ্গে ঘরের আলো জ্বলে উঠল। চোখ পিট্ পিট্ করে তাকাল সবাই। হাজি তাকাল সরাসরি রানার দিকে। ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি। 'বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ওটার মাথা খসিয়ে ফেলা কোন কঠিন কাজ হবে না। সে কাজে এই ফল্টের ষোলো আনা সাহায্য পাব আমরা। জায়গামত পর্যাপ্ত শক্তির কয়েকটা বোমা ওখানে সেট করে ফাটিয়ে দিলেই চলবে, সোজা লেকে আছড়ে পড়বে পঞ্চাশ মিলিয়ন কিউবিক ফিট পাথরের গোটা মাথাটা। সেই সাথে সমপরিমাণ পানি লেক ছেড়ে গিরিখাত দিয়ে ছুটবে,' দু'হাত চিত করল সে। 'ফিনিশ।'

'অতবড় একটা চুড়ো খসাতে যথেষ্ট শক্তিশালী বোমা দরকার হবে,' রানা বলল। 'ফল্ট যতই থাকুক।'

'নিশ্চয়ই! সেকথা ভেবেই এগুলো জোগাড় করেছি আমরা,' ইশারায় দ্বিতীয় টেবিলটা দেখাল সে। ক্যাপ্টেন আরিফ ও নাগিব এগিয়ে গেল সেদিকে, তুলে ফেলল ত্রিপল। পাশাপাশি তিনটে প্রায় গোল, গ্র্যানিট গ্রে মেটালের বল দেখতে পেল সবাই। পাঁচ নম্বর ফুটবলের দ্বিগুণ হবে আকারে। অনুজ্জ্বল রঙের করোগেটেড সারফেস। তিনটেরই মাঝ বরাবর একটা করে ধাতব ব্যান্ড, দেখে মনে হয় দুই অর্ধেক গোলককে ধরে রেখেছে। ওগুলোর ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ড্রিল করে ছিদ্র তৈরি করা হয়েছে, ছিদ্রের মাথা দিয়ে বেরিয়ে আছে প্রলম্বিত কানা।

'জিনিসগুলো দেখতে ঝিনুকের মত,' বলল হাজি। 'কাজেই এদের ওই নামেই ডাকব আমরা—অয়েস্টার। আসলে এগুলো মিনিয়েচার এইচ-বম্ব।'

'হাইড্রোজেন বোমা!' কেউ একজন গুঙিয়ে উঠল অস্ফুটে।

'হ্যাঁ। তবে ভয়ের কিছু নেই, এমনি এমনি ফাটবে না। কারণ এগুলো প্রি-সেট বোমা, ফাটাতে হলে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সমিটারের সাহায্যে চার অক্ষরের কোডেড মেসেজ পাঞ্চ করতে হবে। অতএব নিশ্চিন্ত থাকুন। আরিফ, আরেক দফা চায়ের কথা বলে পাঠাও।'

চা এল, কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে চুমুক দিতে লাগল। কমান্ডোদের দু'একজনকে নার্ভাস মনে হলো রানার, বিশেষ করে জর্ডানিয়ান আল মসউদ ও মিশরীয় জুবায়ের পাশাকে। ফ্যাকাসে চেহারায় হাঁটাহাঁটি করছে দু'জন। কোথাও স্থির হতে পারছে না।

ওদিকে রানা, আল সাউদ ও আরাবী যে যার আসনে বসা। চায়ে চুমুক দিয়ে রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল,

'কেমন বুঝছ, রানা?'

'মন্দ না। কিন্তু ভাবছি আপনাদের, মানে সিরিয়া তো জবরদস্ত আয়োজন করেই রেখেছিল, তবু কাজে নামতে এত দেরি হলো কেন আপনাদের।'

'কারণ সমস্ত প্রস্তুতি এই আয়োজনেই ঠেকে ছিল, কোন্ পথে এগোতে হবে তা ওদের যেমন মাথায় আসেনি, তেমনি আমাদেরও না। মোট কথা কারও মাথাতেই আসেনি। প্রায় সাত মাস এ নিয়ে পণ্ডশ্রম করেও যখন কাজ হলো না, তখনই না শেষ চেষ্টা করে দেখতে রাহাতের কাছে ছুটলাম।'

মাথা দুলিয়ে চায়ে চুমুক দিল ও। 'রাহাত খান মেইরনের জিওলজিক্যাল ফল্টের কথা জানতেন?'

'নিশ্চয়ই! যে ছবিগুলো এতক্ষণ দেখলে, তার সবগুলোই দেখিয়েছি রাহাতকে।'

সেদিন বুড়োর রুমে দেখা প্রোজেক্টর মেশিনটার কথা খেয়াল হলো রানার। তার মানে ও অফিসে পৌঁছার আগেই সে পর্ব সারা হয়ে গিয়েছিল। চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে ঘুরে তাকাল। দেখল সাদিক মাহের ও মসউদ গম্ভীর চেহারায় দাঁড়িয়েছে গিয়ে বন্ধ এক দরজার কাছে। সাদিক কিছু বলছে, অন্যজন মাথা দোলাচ্ছে থেকে থেকে। কিন্তু বেশিক্ষণ সুযোগ পেল না, কর্নেল হাজির ডাক শুনে তাড়াতাড়ি চেয়ারে এসে বসে পড়ল।

'এতক্ষণ মিশনের ডিটেইলড্ পরিকল্পনা শুনলেন আপনারা,' বলল কর্নেল। 'এ নিয়ে যার যা প্রশ্ন আছে, করতে পারেন এখন। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করবেন, প্লীজ!'

পিছন থেকে রানার দিকে ঝুঁকে এল আতাসী। নিচু গলায় বলল, 'বস্, যদি ধরা পড়ি ইহুদীদের হাতে, কি ঘটবে ভাগ্যে?'

'প্রথমে যা-ই ঘটুক, শেষে জুটবে সাড়ে তিন হাত মাটির

বিছানা,' জবাব দিল ও।

'ইস্, মার্সিয়ার কাছে ভাল করে মাফ-টাফ চেয়ে আসা উচিত ছিল। অনেক অন্যায় করেছি ওর ওপর।'

মুচকে হাসল রানা। আর কিছু বলল না। প্রথম প্রশ্ন এল মিশরীয় ক্যাপ্টেন আব্বাসের তরফ থেকে। 'বোমাগুলোর...'

'উঁহু!' বাধা দিল কর্নেল হাজি, 'অয়েস্টার বলুন।'

'রাইট, স্যার। ওগুলোর একেকটার ওজন কত?'

'ঠিক ষাট পাউন্ড করে।'

'কিভাবে ফাটানো যাবে?'

'অনেকভাবে যাবে,' নাক টানল কর্নেল। 'মনে মনে ওগুলোকে ইলেকট্রনিক লক্ ভাবুন। এমন লক্, খুলতে বিশেষ চাবি প্রয়োজন হবে। সেটা হবে কোনও এক ধরনের সাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সি; কণ্ঠস্বর, মোর্স, অথবা কোন্ গানের কলিও হতে পারে। এগুলোর ক্ষেত্রে চার গ্রুপের সংখ্যা হবে সেই ফ্রিকোয়েন্সি।'

'কোন্ কোন্ সংখ্যা,' জানতে চাইল সাদিক মাহের্।

'দুঃখিত, এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারছি না। মিশন লীডার ছাড়া আর কাউকে তা জানানো যাবে না। ট্রান্সমিটার তাঁর কাছে থাকবে,' তিনি ছাড়া আর কেউ জানবে না সেসব।

'কিন্তু সে সময় আসার আগেই, মানে, অয়েস্টার সেট করার আগেই যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় লীডারের?' বলল আব্বাস। 'তিনি আহত হতে পারেন, নিহতও হতে পারেন। অথবা ট্রান্সমিটার অকেজো হয়ে যেতে পারে, তখন?'

'তেমন কিছু যদি ঘটেই যায়, সময়মত ডিসট্রেস সিগন্যাল পাঠাবে সার্জেন্ট জুবায়ের, আমরা ফিরে আসার নির্দেশ পাঠাব আপনাদের। অথবা যদি শত্রুর হাতে ধরা পড়ার ভয় না থাকে, তাহলে এগিয়ে যেতে বলব। সে ক্ষেত্রে দলের নতুন নেতা হবেন

ক্যাপ্টেন আব্বাস।'

দেখতে দেখতে চেহারা লাল হয়ে উঠল সাদিক মাহেরের। 'মিশন পরিচালিত হচ্ছে সিরিয়া থেকে, আমি একজন সিরিয়ান। এ সুযোগটা আমাকে কেন দেয়া হলো না জানতে পারি?'

কয়েকটা দেশের স্বার্থে সবাই এক হয়ে মিশনে যাচ্ছেন আপনারা। এখানে সিরিয়ান, জর্ডানিয়ান বিভক্তি টেনে এনে তিক্ততা বাড়াবার চেষ্টা করবেন না কেউ। ব্যাপারটা ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে।'

'উইথ রেসপেক্ট, এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না,' একরোখা গলায় বলল ক্যাপ্টেন।

'তবু এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আপনাকে,' বলে জর্ডানিয়ান মসউদের দিকে ফিরল সে। 'ইয়েস?'

'ফ্রন্টিয়ারের ব্যাপারটা, স্যার।'

'ইয়েস?'

'আমরা কি করে বুঝব কখন ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করলাম?'

জবাবটা দিল আতাসী। 'ওরা গোলাগুলি শুরু করলেই বুঝে যাবে, কারা।'

হো হো করে হেসে উঠল সবাই। সাদিক মাহের হাসল না। মনে হলো শুনতেই পায়নি মন্তব্যটা।

'এ ব্যাপারে আগেই বলা হয়েছে,' একটু পর বলল কর্নেল। 'লাল ডাই দিয়ে জায়গামত লাইন এঁকে রেখে এসেছে নাগিব। দাগের ওপর গাছের ডাল ফেলে রাখা হয়েছে জায়গাগুলো যাতে বরফে ঢাকা পড়ে না যায়।'

'আমার একটা প্রশ্ন আছে, স্যার,' বলল জুবায়ের।

এবারও আতাসী ফোড়ন কাটল। 'ঝাঁপিটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করুন, কর্নেল। নইলে এ যন্ত্রণা সারাদিনেও ফুরাবে না।'

মিটিমিটি হাসি মুখে সার্জেন্টকে দেখল কর্নেল। 'সেটা কি?'

'স্যার, জায়ন লেকের বন্যায় যাফাতে কত মানুষ মরবে? পাঁচ, আট, নাকি দশ হাজার?'

ভুরু কুঁচকে উঠল কর্নেলের। 'এ প্রশ্ন অবান্তর। যত হাজারই মরুক, এখন তা বিচারের সময় নেই। ইউ আর অলরেডি কমিটেড, অ্যান্ড ইউ আর আ সোলজার, রিমেমবার দ্যাট।' লোকটাকে বসে পড়তে দেখে নরম হলো হাজি। বলল, 'যদি কোনদিন ওদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ফের খারাপ হয়, ওই প্ল্যান্টের ছোঁড়া একেকটা মিসাইলে কত আরব মরবে কেউ ধারণা করতে পারেন? দশ হাজার হতে পারে, পনেরো হাজার, এমনকি বিশ হাজারও হতে পারে। তাদের মধ্যে এখানকার অনেকের পরম আত্মীয়ও হয়তো থাকবে। কাজেই ওই চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দেয়া ভাল।

'আজ আমরা যে কাজ করতে যাচ্ছি, জেনে রাখো, তার জন্যে আমরা দায়ী নই, দায়ী ওরা। ইসরাইল আমাদের বাধ্য করেছে একাজে।' একটু বিরতি দিল কর্নেল। 'নাকি তাতে কোন সন্দেহ আছে তোমার, সার্জেন্ট?'

সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল সে। দ্রুত মাথা দোলাল। 'না, স্যার।'

'অল রাইট। আর কোন প্রশ্ন?'

'আমার একটা প্রস্তাব আছে, কর্নেল,' আতাসী বলল।

'কি?' আবার ভুরু কুঁচকে উঠল তার।

'অয়েস্টার তিনটার জায়গায় চারটে করা হোক।'

দ্বিধাগ্রস্ত চেহারা হলো হাজির। 'বুঝলাম না, কেন?'

'তিনটা সেট করা হবে পাহাড়টার ঘাড়ের ফাটলে,' সিরিয়াস চেহারায় বলল আতাসী। 'বাকিটা আমি সেট করব ওটার

পিছনদিকে, দেহের মাঝ বরাবর।'

ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল সবাই। সাদিক মাহেরও বাদ গেল না এবার।

চার

'এবার অন্য প্রসঙ্গ,' বলল কর্নেল হাজি। 'নাগিব সম্পর্কে কিছু বলে নেয়া প্রয়োজন। 'ওর জন্ম এখানেই, মেতুলায়। এক সময় মেষপালক ছিল, বর্তমানে আমাদের মহামূল্যবান এক সম্পদ, ইনফর্মার। মেতুলার একশো মাইল রেডিয়াসের সবকিছু তার নখদর্পণে। একটু আগে জায়ন লেক আর মেইরন পাহাড়ের যে স্টিলগুলো আপনারা দেখলেন, তার কয়েকটা দু'মাস আগে নাগিবের তোলা। এক মাস আগে শেষবার ঘুরে এসেছে সে ওখান থেকে।

'এর আগেও অনেকবার সীমান্তের ওপারের আর্মি মুভমেন্ট ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর আনতে পাঠানো হয়েছে নাগিবকে, কখনও হতাশ হতে হয়নি। এবং নাগিবের তথ্যে কোন ফাঁকও পাইনি আমরা। কাজেই আপনাদের লেক জায়ন পর্যন্ত সফরের রুট ম্যাপ তাকে দিয়েই করিয়েছি। অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা ছিল লোকটার, সেকেলে অবশ্য। আমরা ট্রেনিং দিয়ে অত্যাধুনিক করেছি, কাজেই আশা করছি তার ম্যাপ অনুসরণ করে নিরাপদেই জায়গামত পৌঁছতে পারবেন আপনারা।

'বছরের এই সময় সীমান্ত অতিক্রম করতে ঠাণ্ডা আর বরফ অনেক সাহায্য করবে আপনাদের,' বলে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হাসল। 'অবশ্য কষ্টও হবে। এবং সে কথা ভেবে এখানে আমরাও কষ্ট পাব। কিন্তু...' থেমে শ্রাগ করল। 'প্রকৃতির ওপর তো মানুষের হাত নেই, কি আর করা! নাগিব যে পথে সব সময় আসা যাওয়া করে, সে পথ সারাবছরই ভীষণ বিপজ্জনক, এই সময় তো আরও। সারা পথে হয়তো এক-আধটা ইসরাইলী টহল পার্টির দেখা পাবেন আপনারা, আবার না-ও পেতে পারেন। পরেরটার সম্ভাবনাই বেশি। আর যদি দেখা পেয়েই যান, কোথায় কোথায় তা ঘটবে, ম্যাপে সেটাও দেখানো আছে। কাজেই আগে থেকে সতর্ক হলে কোন সমস্যা হবে না আশা করি।'

একটু বিরতি দিল সে। 'আমার বিশ্বাস নিরাপদেই কাজ সেরে ফিরে আসতে পারবে মিশন। অবশ্য একটা জায়গায় বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। লেকে পৌঁছার আগে একটা প্ল্যাটো পড়বে, বেশ খানিকটা খোলামেলা জায়গা। ইসরাইলী গার্ড পোস্ট আছে ওখানে, পার্মানেন্ট। ওই জায়গাটা বিপজ্জনক, ওখানে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আপনাদের।

'এরপর আসে রেডিওর কথা। সাধারণ কোন সামিট অ্যাসল্ট হলে ক্যাম্পসাইট আর মাউন্টেনের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ওয়াকি-টকি সেট আর সিটিওরোলজিক্যাল বুলেটিনের জন্যে শর্ট-ওয়েভ রিসিভার হলেই চলত। ওগুলো মিনিমাম লাইটওয়েট, ড্রাই-ব্যাটারি ইকুইপমেন্ট। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হওয়ার উপায় নেই। চতুর্দিকে লিসনিং-পোস্ট আছে ইসরাইলীদের, ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই রেডিও নিয়ে যেতে হবে মিশনকে। এবং একান্ত প্রয়োজন ছাড়া রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করা যাবে না।'

'ওটার ওজন সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে,' এই প্রথম মৃদু প্রতিক্রিয়া দেখাল মাসুদ রানা।

'জানি,' আবার ক্ষমা প্রার্থনার হাসি ফুটল কর্নেলের মুখে। 'কিন্তু কিছু করার নেই, মেজর। সরি। আপনাদের ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে একেবারে অন্ধ থাকতে পারি না আমরা, ইউ নো! অয়েস্টারের মত জিনিস নিয়ে...' থেমে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'আমি অনেকবার সামিটে চড়েছি,' সার্জেন্ট জুবায়ের বলল গম্ভীর চেহারায়। 'কিন্তু ট্রান্সমিটার নিয়ে উঠিনি কখনও।'

'এবার তোমাকে সামিটে উঠতে হচ্ছে না, সার্জেন্ট।'

'তবু, ওটার ওজনের ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে।'

'বুঝি,' মাথা ঝাঁকাল সে। 'কিন্তু উপায় নেই।' আর কোন মন্তব্য আসে কি না, শোনার জন্যে অপেক্ষা করল কর্নেল। এল না। 'মেজর রানা, আপনি আমাদের তিনবার তিনটা সঙ্কেত দেবেন শুধু। লেক পর্যন্ত পৌঁছে ""অয়েস্টার" কী সিগন্যাল পাঠাবেন। বোমা সেট হলে পাঠাবেন "পার্ল"। তারপর নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে "শেল"। ব্যস্।'

'যদি ইসরাইলীদের হাতে ধরা পড়ি, তখন?' সার্জেন্ট বলল।

মারফতী হাসি দিল কর্নেল। 'সতর্ক থাকলে পড়বে না। সেরকম সম্ভাবনা থাকলে অন্তত এইচ-বম্ব নিয়ে মিশন পাঠানোর কথা চিন্তাই করতাম না আমরা।'

'কিন্তু তারপরও "যদি" বলে একটা কথা আছে।'

'শিওর!' মাথা দুলিয়ে একটা ইংরেজি ইডিয়ম আওড়াল সে। 'ইন ফর আ পেনি, ইন ফর আ পাউন্ড, সার্জেন্ট। তোমরা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকবে, যদি তেমন পরিস্থিতি এসেই পড়ে, লড়াই করবে। সে ক্ষেত্রেও তোমরাই অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছ। তোমরা শত্রুর দেখা পাওয়ার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত থাকবে, ওরা

থাকবে না। কাজেই অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ওদের শেষ করা কোন সমস্যা হবে না।

'তাছাড়া যদি ওরা আসেই, নাগিবের দেয়া তথ্য অনুযায়ী চার থেকে বড়জোর আটজন থাকবে সংখ্যায়। এই ক'জনকে সামাল দেয়া বিশেষ সমস্যা হবে বলে মনে হয় না, বিশেষ করে মেজর মাসুদ রানা যেখানে দলের নেতৃত্বে আছেন।'

'মনে করুন তার জাদুকরী বিদ্যেয় কাজ হলো না, ধরা পড়ে গেলাম আমরা, তখন কি?' ড্যাম কেয়ার চেহারা করে বলল সাদিক মাহের। 'সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই এমন কথা জোর দিয়ে বলতে পারেন না আপনি। এবং আপনি তা আশাও নিশ্চয়ই করেন না। সে ক্ষেত্রে কি সঙ্কেত পাঠাবে সার্জেন্ট, এবং কি পদক্ষেপ নেবেন আপনারা?'

'সেটা...' দ্বিধা ফুটল কর্নেলের চেহারায়। চট্ করে আল সাউদ ও জেনারেল আরাবীকে দেখে নিল। 'সেটা কেবল মিশন লীডার জানবেন।'

দীর্ঘ নীরবতা। 'দুটো সঙ্কেত নিশ্চয়ই?' আবার বলল সিরিয়ান।

'মানে?'

মৃদু হাসি ফুটল যুবকের মুখে। 'বোমা সেট করার আগে ধরা পড়লাম না পরে, তা বোঝাতে নিশ্চয়ই আরও দুটো সঙ্কেত প্রয়োজন হবে!'

চাউনিতে রাগ ফুটল কর্নেলের। কিন্তু সামলে নিল, মৃদু গলায় বলল, 'দুটো না চারটে, সেটাও কেবল লীডারই জানবেন।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ হয়ে গেল ক্যাপ্টেন। চরম অসন্তুষ্ট চেহারা। চোখ কুঁচকে ফ্লোরের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ মুখ তুলে হাসার চেষ্টা করল। 'দুঃখিত, কর্নেল।'

'ইউ উড রেটার বি। মিশনের নেচার সম্পর্কে আগেই ধারণা দেয়া হয়েছে সবাইকে, প্রয়োজন মনে করলে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সুযোগও দেয়া হয়েছে। তা যখন করোনি, এখন উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবার চেষ্টা করবে না, প্লীজ!'

কথাটার ওপর গুরুত্ব দেয়ার জন্যে একটু বিরতি দিল কর্নেল, সময়টা কাজে লাগাল সিগারেট ধরাতে। 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। যদি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, এখান থেকে আমরা রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করব, চার অক্ষরের মেসেজ পাঠাব। সেটা হবে চূড়ান্ত নির্দেশ। "অ্যাবানর্ডন মিশন অ্যান্ড রিটার্ন"। সংক্ষেপে "এ এম এ আর"।'

'শুনে খুশি হলাম,' বিড়বিড় করে বলল আতাসী। 'ওটার বেলায় দেরি করবেন না।'

মৃদু হাসল কর্নেল। 'করব না, বি শিওর।'

মাসুদ রানা নড়েচড়ে বসল। 'মিশন শেষ হোক না হোক, পথে সাপ্লাইয়ের টান পড়বে আমাদের। আমরা নিশ্চয়ই ডাবল ট্রিপের জন্যে প্রয়োজনীয় সাপ্লাই নিয়ে যাচ্ছি না?'

'হ্যাঁ, পড়বে। এবং সে জন্যে বিকল্প ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। ফ্রন্টিয়ারের আগে আমাদের ছোট একটা গ্রাম আছে তিলাত। অল্প কিছু আগে। লোকসংখ্যা কম। এই তিলাতের হেডম্যানের কাছে আপনাদের রিটার্ন ট্রিপের সাপ্লাই থাকবে। ফেরার সময় তুলে নেবেন। যদি ধরা পড়ার মত পরিস্থিতি দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রেও পিছিয়ে এসে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। লোকটার নাম নাসিব। প্রয়োজনে সে আপনাদের আত্মগোপনের ব্যবস্থাও করে দেবে। বুঝতে পেরেছেন?'

মাথা দোলাল ও।

'নাগিবের ম্যাপে ওই গ্রামের নাম পাবেন না আপনি। কারণ

সীমান্তের খুব কাছে ওটা, ইসরাইলীরা যদি কিছু সন্দেহ করে বসে, ম্যাসাকার ঘটিয়ে ছাড়বে। ম্যাপে পাশাপাশি কয়েকটা গ্রামের অবস্থান লাল রঙের বৃত্ত এঁকে দেখানো হয়েছে। ওর মধ্যে যে বৃত্ত একটু চ্যাপ্টা ধরনের, অয়েস্টারের মত, সেটাই তিলাত। আপনাদের যাওয়ার পথের উত্তরে পড়বে, খুঁজে নেবেন।'

সিগারেট মেঝেতে ফেলে বুট দিয়ে পিষে দিল কর্নেল। 'যাওয়া-আসার পথে তিনটে কুঁড়েঘর পড়বে, আপনাদের সুবিধের জন্যে এখানকার ট্রেইনীদের দিয়ে তৈরি করানো হয়েছে। অবশ্য তাড়াহুড়ো করে তৈরি, কতটা ভাল হয়েছে নিশ্চিত বলতে পারছি না। ওদের মতে অবশ্য মন্দ হয়নি। সে যাই হোক, ফেরার পথে ওগুলো আপনাদের কাজে আসবে। ঝড়-বাদল, ব্লিজার্ডের আশঙ্কা দেখা দিলে আশ্রয় নিতে পারবেন। পথে থেমে থেমে এগোতে পারবেন। ওগুলোতেও সাপ্লাই মজুত আছে, এমনকি রেডিও ট্রান্সমিটারও।'

'ইসরাইলীদের টহল গার্ড সম্পর্কে বলুন,' বলল রানা।

'লেকে পৌঁছার আগে ওদের একটা গার্ড হাউস পড়বে বলেছি, ওটাই মূল। নাগিব ওখানে প্রতিবার পাঁচজন করে গার্ড দেখেছে। হাফ প্লাটুন মাউন্টেন ট্রুপ। মাঝেমধ্যে স্কি চড়ে টহল দেয় ওরা, তবে এরকম সময় খুব একটা বের হয় না। গার্ড হাউসেই থাকে, রেডিওতে যোগাযোগ রক্ষা করে সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সের সঙ্গে।'

'সেটা কতদূরে?'

'পনেরো মাইল দূরে, জায়গার নাম মে'ওনা। ওখানকার টহল বাহিনীও কখনও কখনও জায়নে এসে হাজির হয়, হঠাৎ হঠাৎ। খুব কম অবশ্য। বছরের এই সময়ে তেমন একটা আসে না। তাছাড়া আপনাদের সিলেক্টেড রুটে ওরা আসে না।

'অর্থাৎ ড্যাম আনগার্ডেড থাকে?'

মাথা দোলাল কর্নেল। 'অনেকটা। মাত্র হাফ-প্লাটুন সৈন্য ও তিনজন এঞ্জিনিয়ার থাকে ড্যামে। একটা মোটর লঞ্চ আছে, ওটায় চড়ে লেকের এ মাথা ও মাথা চক্কর দেয়।'

'নিয়মিত?'

'নিয়মিত।'

উঠে পড়ল রানা, পায়ে পায়ে মডেলের কাছে এসে দাঁড়াল। চোখ কুঁচকে দেখল কিছুক্ষণ ওটাকে। 'লেকের দুপাশে ড্যাম আর মেইরন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল ও।

মাথা দোলাল হাজি। 'হ্যাঁ।'

'লেকের দৈর্ঘ্য কত?'

'দু'মাইল।'

'আর মেইরনের উচ্চতা চার হাজার ফুট?'

'হ্যাঁ, প্রায়। কিন্তু অত উঁচুতে উঠতে হচ্ছে না আপনাদের, উঠবেন ঘাড়ের ফল্ট পর্যন্ত, বড়জোর তিন হাজার ফুট।'

আবার কিছুক্ষণ মডেল পর্যবেক্ষণ করল ও। 'ওপরে কাজ করার সময় লেক থেকে কেউ যদি মুখ তুলে তাকায়, আমাদের মুভমেন্ট দেখতে পাবে?'

মুখের সামনে মুঠো ধরে খুক্ করে কাশল কর্নেল। 'যদি অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকায়, পাবে। যদিও সে সম্ভাবনা কম। মেইরন ঈগল আর চাফের আখড়া, ওখানে মুভমেন্ট সবসময়ই আছে। কাজেই আশা করা যায় আপনাদেরকে ওগুলোর কিছু একটা ধরে নেবে ওরা।'

আরও প্রায় পনেরো মিনিট একের পর এক প্রশ্ন করে গেল রানা, তারপর মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো। দুপুরে খাওয়া সেরে আরেক দফা বৈঠকে বসতে হলো ওকে দুই জেনারেলের সাথে। কর্নেল হাজি আর ক্যাপ্টেন আরিফও থাকল। ওপেন ডিসকাশনের সময়

উল্লেখ করা হয়নি, মিশন সম্পর্কিত এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট জানানো হলো ওকে। তার মধ্যে একটা তথ্য বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিল।

সেটা হলো, রানা সময়মত নিজের ট্রান্সমিটারের সাহায্যে বোমা ফাটিয়ে দিতে পারলে ভাল, কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয়, বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে মেতুলা থেকে কর্নেল হাজি করবে কাজটা। সে আয়োজন করা আছে। বোমা সেট করার পরে যদি ধরা পড়ে যায় ওরা, বা যদি দেখে আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নেই, সে ক্ষেত্রে প্রাণের ঝুঁকি থাকলেও আগেভাগে বোমা ফাটিয়ে দিতে হবে রানাকে। আর যদি তা কোন কারণে সম্ভব না হয়; যেমন, সেট করার আগেই ধরা পড়ে গেল ওরা, বা ট্রান্সমিটার দেখা গেল কাজ করছে না, সেক্ষেত্রে খবরটা তৎক্ষণাৎ রেডিওর সাহায্যে কর্নেলকে জানাতে হবে। পরের ব্যবস্থা সে করবে। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই দলের সবার মৃত্যু মোটামুটি নিশ্চিত।

ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল মাসুদ রানা, তারপর মনে মনে কাঁধ ঝাঁকাল। কি আসবে-যাবে? এরকম বিপজ্জনক কাজে যে-কোন সময় মৃত্যু যে হতেই পারে, তা কি ও জানে না? নিশ্চয়ই জানে–তাহলে চিন্তা কেন? অনিশ্চয়তা, মৃত্যুর হাতছানি আছে বলেই না এ পেশা বেছে নিয়েছিল ও। আরেকবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে মন থেকে দূর করে দিল চিন্তাটা।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে চেহারা বিমর্ষ হয়ে উঠল জেনারেল আরাবীর। 'সরি, মাই সান,' বললেন তিনি। 'ভাবছ ডেকে এনে এ কোন্ বিপদে ফেললাম, তাই তো? কিন্তু এ ছাড়া প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার অন্য কোন উপায় নেই, রানা। ওই জিনিস ইসরাইলীদের হাতে পড়লে সর্বনাশ ঘটে যাবে। তোমার জায়গায় আর কেউ হলে তাকেও একই নির্দেশ দেয়া হত।'

মৃদু হাসি ফুটল ওর মুখে। 'আমি ওসব ভাবছি না, জেনারেল। জীবনে এর চেয়েও অনেক কঠিন মিশনে গিয়েছি আমি, বহুবার। আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'কি?'

'তিন-তিনটে হাইড্রোজেন বোমা ফাটানো হলে গোটা মেইরন গলে যেতে পারে, সে কথা ভেবে দেখেছেন?'

'দেখেছি, রানা। কিন্তু আর কোন উপায় তো চোখে পড়ছে না। রাহাত অবশ্য বলেছিল দুটো হলেই চলবে, কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, যদি তাতে কাজ না হয়? বিশেষজ্ঞদের মতে ওটার মাথা কম করে হলেও পঞ্চাশ মিলিয়ন কিউবিক ফিট নিরেট পাথরের। অতবড় আর ভারী জিনিস উপড়ে ফেলতে যথেষ্ট শক্তি দরকার, যদি দুটোয় কাজ না হয়? এই সুযোগ জীবনে আর পাব?'

আনমনে মাথা দোলাল ও।

কখন কোন্ সঙ্কেত পাঠাতে হবে, একটা কাগজে তা লিখে ওর হাতে তুলে দিল কর্নেল। পড়ল রানা, দেখা গেল সাদিক মাহেরের ধারণাই ঠিক। আরও দুটো সঙ্কেত জমা ছিল হাজির ভাণ্ডারে। ধরা পড়ার পরিস্থিতি দেখা দিলে সেটা কখন; বোমা সেট করার আগে না পরে, তা বোঝাবার জন্যে রয়েছে ওগুলো। কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ভরে রাখল রানা।

'আরেকটা কথা, রানা,' আরাবী বললেন। 'আমরা জানি কতখানি বিপজ্জনক মিশন এটা, তাই বলছি, যদি তোমার পক্ষে বোমা ফাটানো সম্ভব না হয়, যদি সঙ্কেত পাঠাতেই হয়, ওগুলোর কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে এসে পাঠাবে। সবচেয়ে ভাল হয় কোনও পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে পাঠাতে পারলে। সেট করার পরের ক্ষেত্রে অবশ্য। আর আগের ক্ষেত্রে হলে ওগুলোকে বরফের নিচে পুঁতে রেখে ভেগে আসবে যতদূর সম্ভব।'

'সে দেখা যাবে,' হেসে উঠল রানা। 'সময় হোক। জীবনের মায়া কার না আছে?'

'তা অবশ্য ঠিক।'

কর্নেল হাজি নড়েচড়ে বসল। 'কাল রওনা হচ্ছেন আপনারা, মেজর। তাই আজ বিকেলে খানিকটা এক্সারসাইজ করে নিতে হবে। অয়েস্টার ক্যারি করার জন্যে অ্যালুমিনিয়ামের বিশেষ স্লেজ তৈরি করা হয়েছে আপনাদের জন্যে। হয়েছে মানে হচ্ছে, এখনও এসে পৌঁছায়নি,' ঘড়ি দেখল সে। 'আশা করছি যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে। জিনিসপত্র যথেষ্ট থাকবে দলের সাথে—টেন্ট, রেডিও ইকুইপমেন্ট, ক্লাইম্বিং গিয়ার, অস্ত্র-গোলাবারুদ, সব মিলিয়ে ওজন অনেক হবে।

'এতসব বহন করতে স্লেজের চেয়ে আদর্শ বাহন আর হতে পারে না এ অঞ্চলে। ওগুলো ম্যানিউভার করাও খুব সহজ হবে আপনাদের জন্যে। সবচেয়ে বড় সুবিধে, ওগুলো বরফের ওপর দারুণ চলে।' কানের ওপরটা চুলকাল সে। 'অবশ্য আবহাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। রিপোর্ট যা পাচ্ছি, তাতে মনে হয় কাল বিকেল নাগাদ পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে পারে। কিন্তু কতখানি, বোঝা যাচ্ছে না। আমরা তুলযুক গ্লেসিয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দেব আপনাদের।'

রানা কোন মন্তব্য করল না। ওর মন জুড়ে আছে আসন্ন অভিযানের চিন্তা। আরেকজনের চিন্তাও আছে তার মধ্যে। ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও সত্যি, রাঙার মার চিন্তা। ঢাকা ছেড়ে আসার দিন রাতে যখন বুড়িকে খবরটা জানাল ও, অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল সে। তিন মাস পর আবার রানা অনিশ্চিত যাত্রা করছে, বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি রাঙার মা।

আসার সময় অনেকক্ষণ ধরে ওর মাথায় হাত রেখে বিড়বিড়

করে দোয়া-দরূদ পড়েছে বুড়ি। কেঁদেছে ঝরঝর করে। দৃশ্যটা থেকে থেকে চোখের সামনে ভেসে উঠছে, কিছুতেই ভুলতে পারছে না রানা।

পরদিন দুপুরে যাত্রা করল ডুমসডে মিশন। দুটো বেজিমুখো উইযেল ট্র্যাক্টর ও ত্রিপল ঢাকা একটা ট্রাকের বহরে চেপে। সদস্যদের সবার পরনে স্নো কমব্যাট স্যুট—সাদা। ট্রাক থাকল আগে। স্লেজ, অয়েস্টার, সাজ-সরঞ্জাম ও সাপ্লাই আছে ওটায়।

প্রথম ট্র্যাক্টরের সামনের আসনে বসল মাসুদ রানা, ক্যাপ্টেন আরিফ চালাচ্ছে। পিছনে বসেছে ক্যাপ্টেন আব্বাস ও লেফটেন্যান্ট মসউদ। পরেরটায় আতাসী, ক্যাপ্টেন মাহের ও সার্জেন্ট জুবায়ের। আঁকাবাঁকা পথ ধরে ওপরে উঠতে লাগল বহর, উচ্চতার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঠাণ্ডা। খানিকদূর গিয়ে পশ্চিমমুখো হলো, পিছাতে পিছাতে মেতুলার সবুজের শেষ চিহ্নটুকুও একসময় মিলিয়ে গেল।

চারদিকে সাদা ছাড়া আর কিছুই নেই। ধপ্‌ধপে সাদা তুষার ও বরফ আছে কেবল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার, নানান অশুভ চিন্তা উঁকিঝুঁকি মারছে মনে। অনেকক্ষণ পর ট্র্যাক্টরের আকাশমুখো নাক সমান হলো, মোটামুটি সমতল জায়গা ধরে কয়েকশো গজ এগোতে বাউলটা চোখে পড়ল রানার। ওদের একটু নিচে, প্রকাণ্ড গামলার মত আকার ওটার—হেলিপ্যাড।

একটা পিউমা কপ্টার, একটা ট্রাক ও কয়েকজন মানুষ দেখা গেল ওখানে। মুখ তুলে ওদের বহরের অগ্রগতি দেখছে। জেনারেল আরাবী, সিরিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান, কর্নেল হাজ্জি, নাগিব ও পাইলট। এবং চারজন সিরিয়ান নন কমিশন। নাগিব আজ আর্মি গ্রেট কোট পরেছে, মাথায় তুর্কী ধরনের টুপি।

ঢাল বেয়ে বাউলে নেমে পড়ল কনভয়। উইযেল থেকে নামল রানা। অন্যরাও ঝুপ্ ঝাপ্ করে লাফিয়ে পড়ল। কথা নেই কারও মুখে। ট্রাকটা ব্যাক করে পিউমার খোলা স্লাইডিং ডোরের কাছে পিছন ঠেকিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে পড়ল চার নন-কম, ট্রাকের মালপত্র কন্টারে তুলতে শুরু করে দিল। পাইলট ভেতরে দাঁড়িয়ে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে চলেছে।

ফিতের তৈরি জালে বাঁধা তিন অয়েস্টার তোলা হলো সবার শেষে। 'এমন সময় ব্যান্ড পার্টির দরকার ছিল,' ওগুলোর ওপর চোখ রেখে নিচু গলায় বলল আতাসী। 'ব্যান্ড ছাড়া এসব জমে নাকি?'

কেউ কেউ হাসল মুখ টিপে, অন্যরা গম্ভীর। চিন্তিত। যাত্রার সময় উপস্থিত, তাই কথা নেই কারও মুখে। জেনারেল আরাবীকে দেখা গেল, উদ্বিগ্ন চেহারায় ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছেন। বাউলের ভেতর বাতাস ঘুরছে, চাপা গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলছে হিম বরফের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে।

রানার সাথে চোখাচোখি হতে কর্নেল হাজি হাসল, পরিবেশ হালকা করার জন্যে বলল, 'আপনারা আমাদের মেস বিল বাকি রেখেই বিদায় নিচ্ছেন, মেজর।'

'এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না, কর্নেল,' রানাও হেসে জবাব দিল। 'জেনারেল আরাবী হচ্ছেন আমাদের পালের গোদা, ওঁর কাছ থেকে চেয়ে নেবেন।'

এবার সবার মুখেই হাসি ফুটল। একটু হাসতে পেরে মনের বোঝা হালকা হলো প্রত্যেকের। বিদায় পর্ব শুরু হলো, মিশন সদস্যদের সাথে একে একে হ্যান্ডশেক করল অপেক্ষমাণ দুই জেনারেল, কর্নেল ও ক্যাপ্টেন। আরাবী হ্যান্ডশেকের ফাঁকে অন্যহাতে জড়িয়ে ধরলেন রানাকে। দেশীয় রীতিতে কানের পাশে

মৃদু চুমু খেয়ে বললেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের হেফাজত করবেন, মাই সান। আবার দেখা হবে, ইনশাল্লাহ্।'

তাঁর দেখাদেখি অন্য তিনজনও আলিঙ্গন করল ওকে। তারপর হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, দৃঢ় পায়ে কয়েক পা হেঁটে পিউমায় উঠে পড়ল। লেফটেন্যান্ট আতাসী টেনে লাগিয়ে দিল দরজা। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠে স্টার্ট নিল প্রকাণ্ড কপ্টার। বাতাসের তোড়ে তুষার উড়তে শুরু করায় খুব দ্রুত আঁধার হয়ে এল চারদিক। অপেক্ষমাণ দলটা ব্যস্ত পায়ে ওটার কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

নাগিবের মাথার টুপি উড়ে যেতে দেখল কপ্টারের সবাই। ছুটল সে ওটার পিছনে, কোটের পেটের নিচের দুই প্রান্ত উড়ছে প্রবলবেগে। উঠে পড়ল পিউমা, দেখতে দেখতে পিচ্চি আকার ধারণ করল নাগিব, টুপি ধরে ফেলল অনেক কষ্টে, পরক্ষণে পা পিছলে হুড়মুড় করে আছাড় খেল। ভেতরে প্রাণখোলা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সার্জেন্ট জুবায়ের পাশা। এক মুহূর্ত মাত্র, পিউমা ঘুরতেই চোখের আড়ালে চলে গেল নিচের গোটা বাউল।

ভেতরে নানান আওয়াজ শুনতে পেল রানা, সূর্যের আলো নাচছে কেবিনের দেয়ালে। ওদের সাদা কমব্যাট স্যুটে আলো প্রতিফলিত হয়ে ঝলমলে হয়ে উঠেছে গোটা কেবিন। নিচে পিউমার ছায়াটা ছুটছে। একটুপর দৃশ্যপট পাল্টে গেল, সাদার মধ্যে এখানে-ওখানে হেরমনের পাথুরে দেয়াল দেখা দিল। এটা চলমান ছবিতে দেখা সেই হাই-আল্টিচিউড ভ্যালি, দেখেই চিনল রানা। পাইলটের কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে তাকাল।

পাথর, তুষার ও বরফের এবড়োখেবড়ো আকৃতি কাছিয়ে আসছে অনবরত, পিছলে চলে যাচ্ছে পিছনদিকে। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে সব। চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুখের ভেতরটা শুকিয়ে উঠল রানার। যতটা সম্ভব নিচ দিয়ে দ্রুতগতিতে

এগিয়ে চলেছে পিউমা। খানিক পর বড় এক পাহাড় দেখা দিতে গতি কমাল পাইলট, পাহাড়ের গোড়ার দিকে ইঙ্গিত করল হাত তুলে। 'প্রথম হাট। আপনাদের সিক্রেট রিফিউজ।'

দেখল রানা। গাছপালার ফাঁকে কিছুটা সমতল জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কাঠের তৈরি ঘরটা। ম্যাপে ফোঁটা দিয়ে দেখানো হয়েছে ওটাকে, মিলিয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট হলো রানা। আবার পিউমার গতি বাড়ল, উপত্যকার ওপর ঘুরে বেড়াতে লাগল ওর নজর। অসংখ্য আইস-স্টীম দেখতে পেল, নীল রগের মত গড়াচ্ছে সাদা সারফেসের ওপর দিয়ে। এখানে-সেখানে বিশাল একেকটা তুষারের ব্রিজ।

ঘড়ি দেখল ও, তারপর ম্যাপ। 'পঁয়ত্রিশ মাইল এসে পড়েছি আমরা। সেকেন্ড হাট আর কতদূর?'

ওর প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই হাত তুলল পাইলট. 'ওই দেখুন। ওই যে, পাথরের ওভারহ্যাংটার নিচে, সরু রিজের ওপর।'

মাথা দোলাল রানা। 'ওটা আছে দেখে খুশি লাগছে,' আতাসী মন্তব্য করল সিরিয়াস গলায়।

হাট ডানে রেখে উড়ে গেল পিউমা। যতক্ষণ ওটাকে দেখা গেল, তাকিয়ে থাকল রানা। একটু পর ঘুরে গেল কপ্টার, সূর্য পিছনে পড়ে গেল। আগে আগে সমান তালে ছুটছে এখন পিউমার প্রকাণ্ড ছায়া। তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে যেন। কাছিয়ে আসছে, ছায়াকে ধরে ফেলছে কায়া, আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। মোহাচ্ছন্নের মত সেদিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। খানিক পর দেখা দিল বিশাল তুলযুক ম্যাসিক।

গতি কমাল পাইলট, গ্লেসিয়ারের কিনারা ঘেঁষে ল্যান্ড করাল পিউমা। কিনারার সামান্য ওপরে পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তৃতীয় হাট। নেমে পড়ল ওরা ছয়জন, জিনিসপত্র

নামাতে শুরু করল ব্যস্ত হাতে। পাইলট নিজের আসনে বসা, স্টার্ট বন্ধ করেনি। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছে মানুষটা। ঘন ঘন উপত্যকা, গ্লেসিয়ার আর আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। দক্ষিণ-পুব থেকে উড়ে আসতে থাকা ঘন কুয়াশার পর্দা দেখাল সে। 'প্লীজ, জলদি করুন!'

যাবতীয় গিয়ার ও সাপ্লাই আনলোড শেষ হতে দরজা লাগিয়ে দিল লোকটা ভেতর থেকে, পারসপেক্স ডোমের ভেতর থেকে মাসুদ রানার দিকে তাকাল। একে একে অন্যদেরও দেখল, তারপর গলার ব্যানডানার নট ঠিক করে ঝুঁকে পড়ল কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর। এক মুহূর্ত পর শূন্যে উঠে পড়ল পিউমা, শেষ মুহূর্তে ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ল লোকটা, কপ্টারের লেজ ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল।

যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে ওটাকে যেতে দেখল সবাই। চোখ দিয়ে ওটাকে অনুসরণ করতে গিয়েই ব্যাপারটা চোখে পড়ল রানার—সূর্য নেই, ঢাকা পড়ে গেছে ঘন কুয়াশার আড়ালে। অথচ একটু আগেও ঝলমল করছিল চারপাশ। আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করেছে হয়তো।

তবু আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ও, কান পেতে শুনল পিউমার আওয়াজ। ক্ষীণ হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল, ফিরে এল আবার, তারপর একেবারে নেই হয়ে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাট ইঙ্গিত করল রানা। 'ভেতরটা একবার দেখে নেয়া যাক্।' অন্যরা নীরবে অনুসরণ করল ওকে।

যত তাড়াহুড়ো করেই তৈরি হয়ে থাকুক, দেখা গেল মন্দ হয়নি ঘরটা। ভেতরে জায়গা আছে বেশ। বড় এক টেবিল রয়েছে মাঝখানে, ওটাকে ঘিরে আছে ছয়টা চেয়ার। কাঠের কিনারা, ঠিকমত চাঁছা হয়নি বলে দেখতে একটু কেমন কেমন লাগছে

ঠিকই, কিন্তু নির্মাণে আর কোন খুঁত নেই। দেয়ালঘেঁষা ছয়টা বাঙ্ক-বেড দেখল রানা। এক কোণে রাখা আছে স্টোভ ও ফুয়েল। ওর পাশে এক পাল্লার একটা কাবার্ড। ওপরে বসে আছে একটা রেডিও ট্রান্সমিটার। শহুরে ভদ্রলোকের মত ঝকঝকে চেহারা।

কাছে গিয়ে ওটার পাল্লা খুলে তাকাল রানা। চারটে তাক, চারটেই ঠাসা। ক্যানড ফুড, ইভ্যাপোরেটেড মিলক্, সুপ কনসেন্ট্রেট্স্, কয়েক ব্যাগ সিরিয়াল এবং দু'বোতল জনি ওয়াকার। শেষের আইটেম দেখে ঠোঁট চাটল জর্ডানিয়ান মসউদ। ইংল্যান্ডে ট্রেনিং নেয়া পাহাড়ী যোদ্ধা সে, ওই জিনিসের ভক্ত। সাদিক মাহেরও দেখল, চোখে চোখে মসউদের সঙ্গে কথা হলো।

জুবায়েরকে একটু নার্ভাস মনে হলো। একটা বাঙ্ক-বেডের পায়ের কাছে ভাঁজ করে রাখা পুরু কম্বলের টেক্সচার অনুভব করল হাত বুলিয়ে। আরেক বেডের পুরু জাজিমে বসে পড়ল আতাসী, দোল দিয়ে পরখ করল।

ঘুরে দাঁড়াল সার্জেন্ট। 'আমি ভাবছিলাম···'

'আমি জানি,' বাধা দিল রানা। 'কিন্তু উপায় নেই।'

'অন্তত এক কাপ চা খেয়ে নিতে পারি যাওয়ার আগে,' মাহের বলল। কাবার্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'না।'

'বেশি সময় লাগবে না,' বলল মসউদ।

'আমি বলেছি "না"।' আতাসীর দিকে ফিরল ও। 'বের হও। স্লেজ লোড করতে হবে।'

'ইয়া আল্লাহ্, তাই তো!' চট্ করে নেমে পড়ল বেদুইন, সার্জেন্টকে হাতের কাছে পেয়ে ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে গেল জোর পায়ে। 'চলো, চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

মসউদ নড়ল না। 'দেখুন, বস্, এখনও চার ঘণ্টা আছে দিনের

আলো। এক কাপ চা খেতে কতই বা…' ব্রেক কষল রানার ভয়ঙ্কর শীতল চাউনি দেখে।

মাহের সাদিক খেয়াল করল না ব্যাপারটা, কাবার্ড ছেড়ে এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'আজকের রাতটা না হয় এখানেই…' ওর সাথে চোখাচোখি হতে সে-ও ব্রেক কষল।

'বলা শেষ হয়েছে তোমাদের?' চাউনির মতই শীতল গলায় বলল রানা। হাত তুলে দরজা দেখাল। 'আউট!'

নড়ল না ওরা। এবার প্রচ্ছন্ন হুমকি ফুটল ওর কণ্ঠে। 'আউটসাইড!'

এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল আব্বাস, তাড়াতাড়ি হাটের দরজা মেলে ধরল। ঘাড় গোঁজ করে বেরিয়ে গেল মাহের ও মসউদ। দোরগোড়ায় পৌঁছে সশব্দে থুতু ফেলল মাহের। দেখেও দেখল না রানা, অনুসরণ করল ওদের। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আব্বাসকে বাইরে থেকে দরজার বোল্ট লাগিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিল। জোর পায়ে ধরে ফেলল ওদের দু'জনকে, তারপর যেন নিজের সাথে কথা বলছে, এমনভাবে বলল, 'থাকা গেলে আমিও খুশি হতাম। কিন্তু ওয়েদার খারাপ হয়ে আসছে বলে তা সম্ভব নয়। আজই ফ্রন্টিয়ার ক্রস করতে হবে আমাদের।'

ওদের কেউ কোন মন্তব্য করল না।

চল্লিশ মিনিট লাগল স্লেজে মাল বোঝাই করতে। সবচেয়ে ভারী আইটেম হচ্ছে তিন অয়েস্টার ও ট্র্যান্সিভার। এক স্লেজে তোলা হলো প্রথমটার দুটো, অন্য স্লেজে বাকি দুটো। তার ওপর ভাগ ভাগ করে চাপানো হলো রেশন, টেন্ট, ক্লাইম্বিং গিয়ার, গুলি, স্লীপিং ব্যাগ, এবং আরও কিছু টুকিটাকি সাপ্লাই।

মাল বোঝাই শেষ হতে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে ফেলা হলো স্লেজ, ক্রস-স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। স্কি, স্কি-পোল ও ছয় জোড়া

র‍্যাকেট বাদ থাকল। এ ছাড়া রইল সবার জন্যে একটা করে পার্সোন্যাল প্যাক, স্ট্র্যাপের সাহায্যে ওগুলো পিঠে ঝুলিয়ে নিল সবাই। তার ওপর কোনাকুনি করে ঝোলাল আর্মালাইট এআর-১৮ রাইফেল, ফুল ম্যাগাজিনসহ।

একটা স্লেজ তিনজনে চালাবে। এক স্কিয়ার থাকবে সামনে; স্লেজের সামনে, রানারের সঙ্গে হ্যান্ডগ্রিপসহ অ্যালুমিনিয়ামের প্রাউ আছে, ওটা ধরে স্লেজ সোজা রাখবে, বা প্রয়োজনে ঘোরাবে। অন্য দুই স্কিয়ার থাকবে পিছনে। পিছনের রানারের সাথে আছে আরেক অ্যালুমিনিয়াম এক্সটেনশন, ওটা ধরে ঠেলবে তারা, বা প্রয়োজনে টেনে দাঁড় করাবে। স্লেজের রানার ছয় ইঞ্চি চওড়া, মোম পালিশ করা মজবুত কাঠের তৈরি। সামনে-পিছনে দুটো করে। প্রস্তুতি দেখে সন্তুষ্ট হলো মাসুদ রানা।

বিনকিউলার চোখে লাগাল। ষোলো মাইল লম্বা তুলযুক গ্লেসিয়ারের পুরোটা জুড়ে নীলচে সবুজ বরফের মেলা। নাগিবের রুট ম্যাপ ওটার বুক ভেদ করে সোজা চলে গেছে আইসফল পর্যন্ত। আইসফল দেখতে পেল না ও, কেবল উঁচু-নিচু বরফের বিস্তৃতি চোখে পড়ছে। সারফেসের দিকে নজর দিল, মোটামুটি সমতলই বলা চলে।

কুয়াশা ও মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলতে শুরু করেছে সূর্য, আলো পড়তে বরফ কোথাও কোথাও ঝিলিক মেরে উঠছে ভাঙা আয়নার মত। আকাশের লক্ষণ দেখেশুনে ভাল মনে হলো না ওর। 'স্কি পরে নাও,' নির্দেশ দিল।

যে যার স্কি-পোল ও র‍্যাকেট তারপুলিন স্ট্র্যাপের সঙ্গে বেঁধে স্কি পরে নিল। জার্মান ল্যাংলাউফেন স্কি ওগুলো, দুনিয়ার সেরা। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে গোড়ালীতে স্ট্র্যাপ বাঁধার সময় মাথার মধ্যে রক্তনালীর নাচন অনুভব করল রানা। পাকস্থলীতে ফাঁকা-ফাঁকা

একটা ভাব। খুব চেনা অনুভূতি, অনিশ্চিত যাত্রার আগে সব সময় হয় এরকম।

সিধে হলো। ঠিক তখনই গ্লেসিয়ার ছুঁয়ে আসা এক ঝলক অসহ্য হিম বাতাস ঝাপটা মারল নাকেমুখে। একই সাথে অস্বস্তিও ছুঁয়ে গেল। কি অপেক্ষা করছে সামনে? ভাবল রানা।

স্কির বাঁধন ঠিক হয়েছে কি না বোঝার জন্যে বরফে পা ঠুকল সবাই। নিশ্চিত হয়ে প্রথম স্লেজের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। গতকাল বিকেলে প্র্যাকটিসের সময় ও ঠিক করেই রেখেছে কে কোন পজিশনে দাঁড়াবে, কাজেই কাউকে কিছু বলতে হলো না। আব্বাস ও জুবায়ের দাঁড়াল ওরটার পিছনে। পরেরটার সামনে থাকল আতাসী, মাহের ও মসউদ পিছনে।

প্রাউর ডানে দাঁড়াল রানা, ওর স্কির পিছনের বাড়তি অংশ থাকল রানারের সামান্য আগে। হাতের তালু চিত করে প্রাউর হ্যান্ডগ্রিপ ধরল ওটার অন্য প্রান্ত সেঁটে থাকল বাঁ পাঁজরে। কমব্যাট স্যুটের সঙ্গে জোড়া টুপির ইয়ার ফ্ল্যাপ বেঁধে সামনে তাকাল ও। গ্লেসিয়ারের ওপাশে রেঞ্জের পর রেঞ্জ বেগুনি রঙের আধিভৌতিক আলোয় ভাসছে। এই আঁধার হয়ে আসছে, এই আলো হয়ে উঠছে।

অস্বস্তিকর ভাবটা ফিরে এল আবার। কোথায় চলেছে ওরা? শঙ্কিত মনে ভাবল, সাদার বিস্তৃতির ওপারে কিসের মধ্যে গিয়ে পড়বে? বাতাসের চাপা গোঁ-গোঁ শব্দে শিউরে উঠল মনে মনে। পিছনে তাকিয়ে অন্যদের দেখে নিল। সবাই প্রস্তুত, এবং সবার চেহারায় অস্বস্তি। রং ফ্যাকাসে।

আতাসীর সাথে চোখাচোখি হলো ওর, নিষ্প্রাণ হাসি ফুটল বেদুইনের মুখে। 'সঙ্গে করে ডগ টীম নিয়ে আসা উচিত ছিল আমাদের, বস্!'

জবাব জোগাল না মুখে, ফের সামনে তাকাল রানা। চারদিকের জমাট বাঁধা প্রান্তরের বিশালত্ব দেখে বুক শুকিয়ে গেছে। বরফে যেন শেকড় গজিয়ে গেছে ওর, নড়তে পারছে না।

আবার পিছনে তাকাল। সবাই প্রস্তুত, নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। 'তোমরা রেডি?' স্ট্র্যাপ্‌ড্ গগলস কপাল থেকে চোখের ওপর নামিয়ে আনল ও।

'ইয়েস, মেজর,' জবাব দিল আতাসী। প্রাউর গ্রিপ রানার মত বুকে বাধিয়ে নড়েচড়ে দাঁড়াল। চট্ করে পিছন ফিরে রানার ও স্কির লেজের দূরত্ব দেখে নিল। 'রেডি!'

'ওকে। লেট'স গো, হোয়াইট ফ্যাঙ!' ঝাঁকি দিয়ে রানার লক্‌মুক্ত করল রানা, গড়াতে শুরু করল স্লেজ।

পাঁচ

কাল স্লেজ নিয়ে মাত্র চার ঘণ্টা প্র্যাকটিস করেছে ওরা, সাধারণ ড্রিল। ওজন কম ছিল তখন, জায়গাটাও ছিল বাছাই করা স্লোপ, তাই বিশেষ সমস্যা হয়নি। কিন্তু এখন হচ্ছে।

ওজনের কারণে দেবে আছে রানার, বিরক্তিকর আওয়াজ করছে। বরফ ভাঙছে মুট্-মুট্ শব্দে, শূন্যে লাফিয়ে উঠে ভাঙা কাঁচের মত ঝিলিক মারছে গ্লেসিয়ারের আলোয়। গজ বিশেক যেতেই রানা বুঝে ফেলল ভুল হয়ে গেছে, কাল আরও কড়া প্র্যাকটিস করা উচিত ছিল। কিন্তু এখন সে ভুল শোধরানোর

উপায় নেই।

স্লেজের ওজন ভীষণ চাপ দিচ্ছে পিছন থেকে, ব্যাকপ্যাকের একটু নিচের উন্মুক্ত জায়গায় ফ্রন্ট ক্রসবারের খোঁচা অনুভব করছে। ওটার এবং পিঠের ব্যবধান বাড়াতে প্রাউর ওপর যথাসম্ভব ঝুঁকে থাকল রানা। গতি পেল স্লেজ, ভারসাম্য বজায় রাখতে অজান্তেই খানিকটা পিছিয়ে এল ও, পরক্ষণে মেরুদণ্ডে বারের গুঁতো খেয়ে ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল।

পিছন থেকে এক্সটেনশন টেনে ধরে গতি কমাল আব্বাস ও জুবায়ের। 'চেক ইট!' চেঁচিয়ে ওদের সতর্ক করল রানা। কথাটা বলার সময় মুখ ঘুরিয়ে পিছনে তাকিয়েছিল, এই এক মুহূর্তের অসাবধানতায় বড় ধরনের এক দুর্ঘটনা প্রায় ঘটেই যাচ্ছিল। ও পিছনে তাকানোমাত্র স্লেজের নাক ঘুরে গেল খানিকটা, দ্বিতীয় স্লেজের পথের ওপর চলে এল।

সংঘর্ষ এড়াতে নিজেরটার মুখ ঘুরিয়ে দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল আতাসী, কিন্তু হলো না। ওরটার ধাক্কায় বেহাল দশা হলো রানার স্লেজের, দুটোই একযোগে ছুটে গেল বাঁ দিকের চওড়া এক ফাটলের দিকে। চেঁচিয়ে উঠল কেউ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিপদ ঘটল না, ফাটলের কিনারায় জমে থাকা উঁচু তুষার ঠেকিয়ে দিল ওদের।

কিন্তু রানা রেহাই পেল না, মেরুদণ্ডে ক্রসবারের ধাক্কা সামাল দিতে না পেরে উড়ে গিয়ে নাক-মুখ গুঁজে আছড়ে পড়ল তুষারের স্তূপে। একটু পর উঠে বসল ও, যন্ত্রণায় দপ্-দপ্ করছে নাক। অন্যরা ছুটে এল। 'তুমি ঠিক আছ, বস্?' আতাসীর উদ্বিগ্ন গলা শুনতে পেল রানা। এক হাতের গ্লাভ খুলে নাক স্পর্শ করল, টের পেল রক্তের দুটো ধারা জমাট বেঁধে আছে দুই ফুটো বরাবর।

'হ্যাঁ, ঠিক আছি।' গ্লাভ পরে নিয়ে নিজের স্কির দিকে তাকাল

ও। যদি উড়ে যাওয়ার সময় স্লেজের রানারের নিচে চাপা পড়ত ওর কোনটা, সর্বনাশ ঠেকানোর উপায় থাকত না। স্রেফ দু'ভাগ হয়ে যেত গোড়ালির হাড়। 'এগুলো বরফ,' বলল ও। 'তুষার নয়। আরও ধীরেসুস্থে এগোতে হবে আমাদের। পিছনে টান রাখতে হবে।'

রক্ত মাখা থুতু ফেলল ও, মাঝপথে জমে গেল দলাটা, বরফের ওপর পড়ল ধাতব ঠং শব্দে। আতাসীর দিকে ফিরল। 'আমাদের অন্তত একশো গজ পিছনে থাকবে তোমরা, বুঝতে পেরেছ?'

এবার সতর্ক হয়ে এগোল ওরা। আব্বাস ও জুবায়ের এক্সটেনশন ধরে টেনে রাখল স্লেজ, ওটা যাতে অতিরিক্ত গতি না পায়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখল। গতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে স্কি ইংরেজি 'ভি'-এর মত মেলে রেখেছে ওরা। গ্লেসিয়ারের বাঁদিকের চ্যানেল ধরে ককাতে ককাতে এগোল স্লেজ, থেকে থেকে চাপা গোঙানি ছাড়ছে রানার।

একটু পর গ্লেসিয়াল ঢালে পৌঁছল প্রথম স্লেজ। সামনে নজর দিল রানা, ঢাল দেখে মনে হলো ওটা বুঝি তুলযুকের সুদীর্ঘ জিভ। একেবারে ঝকঝক করছে। পিছনে তাকাল। দেখল আতাসীর স্লেজ বেশ অনায়াসে আসছে পিছন পিছন। তুলযুকের কাঁধ ঘুরে খোলা জায়গায় পৌঁছল ওরা, সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ঝাপটায় রানার মুখে যেন আগুন ধরে গেল।

কিন্তু উপায় নেই, এর মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। মিনিটখানেক বিরতি দিয়ে আবার এগোল রানা, দুই স্কির মাঝখানে সামান্য ফাঁক। দুই রানারের মধ্যে ওগুলোর লেজ। বাউন্স করল স্লেজ, ডানদিকের রানার বড়জোর দুই ইঞ্চির জন্যে মিস করল ডান স্কি।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে উঠল ওর। মারাত্মক বিপদ মাত্র কয়েক

ইঞ্চি তফাতে ওত পেতে আছে, একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই···সকেটের মধ্যে এক পা দুমড়ে মুচড়ে আছে, চিন্তাটা দূর করে দিল ও মন থেকে। দু'পাশের গোড়ালি এক করে ফাঁকটা বুজে দিল। এদিকটায় কড়া নজর রাখতে হবে, নিজেকে সতর্ক করে দিল রানা, পা কোনমতেই ফাঁক রাখা চলবে না।

প্রাউ ধরে টানল, গ্লেসিয়ারের ক্রাউনে চড়তে হবে। কিন্তু নড়ল না ওটা, গ্যাঁট হয়ে থাকল। পিছন থেকে সর্বশক্তিতে ঠেলতে লাগল ক্যাপ্টেন ও সার্জেন্ট, তবু না। হঠাৎ কি ভেবে জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এল আব্বাস, স্লেজ ধরে এক পাশে টান দিল। এবার কাজ হলো, লেজের সাথে প্লাউ ঘুরল। এভাবে কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে করে হঠাৎ সামনে ঠেলা দিতেই গড়াতে শুরু করল রানার।

হোঁচট খেয়ে এগোল রানা, হাঁপাতে হাঁপাতে ধন্যবাদ জানাল সঙ্গীদের। ক্রাউনে উঠতে গিয়ে জান বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা হলো সবার। তবে সঠিক পন্থা জানা থাকলে কাজ যত কঠিন হোক, শুরু করলে এক সময় না এক সময় ঠিকই শেষ হয়। ডুমসডের বেলায়ও হলো। কল-লাইনে স্লেজ থামিয়ে বেশ কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল দল।

এই সুযোগে সামনে সদ্য উন্মুক্ত হওয়া দিগন্ত বিস্তৃত বরফের রাজ্যে চোখ বুলিয়ে নিল মাসুদ রানা। ঘড়ির হিসেবে দিনের আলো আরও দু'ঘণ্টা থাকার কথা ছিল, কিন্তু প্রকৃতির হিসেবে ঘটল অন্যরকম। আকাশের অবস্থা দেখে সবাই বুঝল আজ আর সূর্যের মুখ দেখতে পাওয়ার চান্স নেই, ক্রমে ঘন হতে থাকা মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। বাতাস বাড়ছে। আওয়াজ শুনলে কাঁপন ধরে বুকে।

শেষ দৌড় শুরু করার জন্যে উঠল রানা। সবাইকে যার যার জায়গায় অবস্থান নিতে বলে নিজেও নিল। হাল ধরল প্রথম

স্লেজের, ওদিকে আতাসীও। রানার সাথে চোখাচোখি হতে কালো গগলসের নিচে ঝকঝকে দাঁত দেখা দিল বেদুইনের। হাসল রানাও, পরমুহূর্তে সামনে নজর দিল। 'মুভ!'

পাথরের মত শক্ত বরফের ওপর স্বচ্ছন্দে ঘুরতে শুরু করল এবার রানার, নাক সামান্য নিচু করে সড়সড় করে পিছলে নামতে শুরু করল স্লেজ। সামনে-পিছনে থাকল ছয় স্কিয়ার। মাইলখানেক নেমে আরও গতি পেল ভারী দুই বাহন, নিস্তরঙ্গ লেকের বুকে সাঁতার কাটা রাজহাঁসের মত স্বচ্ছন্দে নেমে যেতে থাকল। বাতাসের তোড়ে কমব্যাট স্যুট সেঁটে থাকল ছয় অভিযাত্রীর বুক, পেট ও উরুর সাথে, ত্রিপলের শক্ত প্রান্ত অনবরত ফড়াৎ ফড়াৎ শব্দে বাড়ি খেতে লাগল স্লেজের অ্যালুমিনিয়ামের দেহে।

এক ঘণ্টায় দশ মাইল অতিক্রম করল ডুমসডে মিশন। ততক্ষণে আরও আঁধার হয়ে গেছে চারদিক, বাতাসের গোঁ-গোঁ তীক্ষ্ণ হুইস্‌লে পরিণত হয়েছে। সোজা দাঁড়িয়ে থাকাই দায়। কাজেই আর এগোনো ঠিক হবে না ভেবে থামার নির্দেশ দিল রানা, ঢালের একপাশে নরম তুষারের স্তূপ দেখে সেদিকে ঘুরিয়ে দিল প্রাউ।

ওটার সাথে কোনাকুনি ধাক্কা খেল স্লেজ, উল্টে পড়তে পড়তেও সামলে নিল শেষ পর্যন্ত। পরেরটাও থামল পাশে। ফল-লাইনের সামান্য দূরে উপযুক্ত পাথরের আড়াল খুঁজে বের করে তাঁবু খাটাল ওরা, আঁধার বাড়ছে দেখে তাড়াতাড়ি স্লেজ থেকে প্রেশার-কুকার, প্রয়োজনীয় ফুয়েল ও রেশন, তুষার গলানোর প্যান্ ম্যাট্রেস, স্লীপিং ব্যাগ ইত্যাদি বের করে বাকি সব বেঁধেছেঁদে রাখল।

তারপর আরেকটা জরুরী করণীয় কাজ সারতে হেঁটে এগোল রানা। অন্যরাও এল সঙ্গে। নাগিবের ম্যাপে আছে, ওদের বর্তমান

অবস্থানের কিছু আগে হঠাৎ বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে ফল-লাইন, প্রায় নব্বই ডিগ্রী। তারপর আরও নিচে গিয়ে মিশেছে পাথরের বেডের সাথে। কিন্তু তেমন কিছু দেখল না ওরা জায়গামত পৌঁছে। পাথরের আভাস পর্যন্ত নেই নিচে।

অনেক নিচের সঙ্কীর্ণ গিরিখাত পর্যন্ত ঢাকা পড়ে আছে বরফের তলায়। বরফের জমাট বাঁধা সাগর যেন, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

বাইরে আঁধারের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাতাসের শক্তি। গিরিখাতের অসংখ্য ক্লিফের গায়ে তার মাথা কোটার ভীতিকর আওয়াজ শুনে গায়ে কাঁটা দিল রানার। ওর মধ্যে ভয়ঙ্কর অশুভ কি যেন আছে। হ্যারিকেনের হলদেটে আলোয় রানার গম্ভীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল আব্বাস। বলল, 'ওয়েদার মনে হয় বেশিরকম খারাপের দিকে টার্ন নিচ্ছে, মেজর।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ও। 'তেমন আশঙ্কাই ছিল।'

'এত হওয়ার কথা বোধহয় ছিল না,' মসউদ মন্তব্য করল। 'ক্যাপ্টেন আরিফ বলছিল...'

'ব্লাডি আরিফ!' বলে উঠল মাহের। নিজের ব্যাকপ্যাক খুলল, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একটা ফ্লাস্ক।

'কি আছে ওর মধ্যে?' ক্যাপ্টেন আব্বাস প্রশ্ন করল।

'স্কচ,' বলে বড় এক চুমুক পেটে চালান করল সে।

'স্কচ!' সন্দেহ ফুটল আব্বাসের চেহারায়। 'কোথায় পেলে?'

'কায়রো এয়ারপোর্ট থেকে কিনেছি,' বলে ভুরু কোঁচকাল সিরিয়ান। 'জেরা করছ মনে হচ্ছে?'

'কয় বোতল?' এবার আতাসী প্রশ্ন করল।

'যথেষ্ট।' আরেক ঢোক গিলল সে।

'যথেষ্ট মানে?'

'মানে ওর একার জন্যে যথেষ্ট আর কি,' আতাসী বলল। 'কাউকে ভাগ না দিয়ে খাবে।'

চোখ কুঁচকে ওকে দেখল ক্যাপ্টেন, ফ্লাস্ক এগিয়ে দিল। 'নাও, দু'ঢোক খেয়ে নাও।'

'সরাও ওটা,' বিরক্ত গলায় বলল আতাসী।

'কাম অন। হ্যান্ড সাম।'

'না।'

এবার সবাইকে উদ্দেশ করে ফ্লাস্ক দোলাল মাহের সাদিক। 'যার ইচ্ছে হয় দু'এক ঢোক খেতে পারো,' বলে আতাসীর নাকের সামনে ধরল ওটা। 'নাও।'

'বলছি তো খাব না!'

'তাহলে কেন বললে কথাটা?' গলার স্বর বদলে গেল তার।

জবাবে হাত তুলে ফ্লাস্কটা দূরে সরিয়ে দিল বিরক্ত লেফটেন্যান্ট।

'কেন অমন ফালতু মন্তব্য করলে?'

আতাসীর কপালের দু'পাশের রগ্ দপ্-দপ্ করছে দেখল রানা। বুঝতে পারছে রেগে উঠছে বেদুইন, অনেক কষ্টে সামলে রেখেছে নিজেকে। এর কারণ বুঝতে দেরি হলো না ওর। এরকম উচ্চতায় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ তেমন থাকে না মানুষের। অসহ্য ঠাণ্ডা, ঝোড়ো বাতাস, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা করে দেয়। এদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে, অতএব সময় থাকতে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন মনে করল ও। নইলে যা-তা কাণ্ড বেধে যেতে পারে।

'থামো সবাই,' বলল ও। 'এটা ঝগড়ার সময় নয়।'

পাঁই করে ওর দিকে ঘুরল মাহের। 'তাহলে কথাটা কেন

বলল ও? কি অর্থ হতে পারে...'

'আমি বলছি এটা ঝগড়ার সময় নয়,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'অন্য অনেক জরুরী কাজ পড়ে আছে আমাদের সামনে। বাদ দাও এসব।'

ওর কথা পুরো শেষ হয়নি, তার আগেই মাহেরের ফ্লাস্ক লক্ষ্য করে থাবা চালাল আতাসী। কেড়ে নিয়ে ঢক্-ঢক্ করে কয়েক ঢোক খেয়ে নিল। ফিরিয়ে দিল ফ্লাস্ক। বোকার মত ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল মাহের, তারপর ফ্লাস্ক ঝাঁকিয়ে দেখল। লাল আভা ফুটল দুই গালে। 'এত করে সাধলাম, খেলে না। এখন কেন খেলে?' আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলল সে।

'ইচ্ছে হয়েছে, তাই খেয়েছি!' খেঁকিয়ে উঠল ও। মুঠো পাকিয়ে গেছে দু'হাত।

'কেন অনর্থক ইচ্ছে হবে? কেন অপচয়...' ব্যাপার হয়তো আরও খানিকটা গড়াত, কিন্তু প্রকৃতি বাধা দিল হঠাৎ করে। নিচের আইসফলে এত ভয়ঙ্কর শক্তিতে আছড়ে পড়ল বাতাস, মনে হলো একযোগে হাজারটা কামান গর্জে উঠেছে বুঝি।

'ওই শোনো,' কান খাড়া করে বলল আব্বাস।

ঝগড়া থেমে গেল, চেহারা থেকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি মিলিয়ে গেল দু'জনেরই। কান পাতল। ক্রমাগত ভয়াবহ বুম্‌ম্-বুম্‌ম্ শব্দে মাথা কুটছে বাতাস! প্রতিবার আওয়াজের সাথে ওদের বুকেও মুগুরের ঘা পড়ছে। প্রথমে কিছুক্ষণ ভোঁতা শোনাল শব্দটা, তারপর ক্রমে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। মনে হলো দানবীয় হিংস্র কোন প্রাণী আটকা পড়েছে আইসফলে, মুক্তি পাওয়ার জন্যে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়ছে অনবরত।

হঠাৎ হি-হি করে ছেলেমানুষের মত হেসে উঠল সার্জেন্ট জুবায়ের পাশা। হ্যারিকেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কি

ভাবছি জানো?'

'আহাম্মকের মত কথা বলছ তুমি,' ফ্লাস্কের মুখ লাগাবার ফাঁকে বিরক্ত গলায় বলল সাদিক মাহের। 'আমরা কি অন্তর্যামী নাকি যে তোমার মনের কথা বুঝতে পারব?'

হাসি অমলিন থাকল পাশার। বলল, 'অন্ধকারে জ্বলজ্বলে হলুদ একটা বাক্সের কথা ভাবছি আমি। কেমন দেখাচ্ছে ওটাকে কে জানে?'

'আমাদের টেন্টের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'কে দেখতে আসছে?' বলল মসউদ।

শ্রাগ করল সার্জেন্ট। 'কি জানি! হয়তো ইসরাইলী টহল গার্ড।'

'দূর! এই বাজপড়া জায়গায় কেন আসতে যাবে ওরা? গার্ড দেয়ার কোন্ কচু আছে এখানে?' শুধু গলা শুনে মনে হবে সার্জেন্টকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করছে বুঝি আব্বাস, কিন্তু তার চেহারা দেখে রানার মনে হলো আসলে নিজেকেই বিশ্বাস করাতে চাইছে।

'কে বলতে পারে?' বিড়বিড় করে বলল জর্ডানিয়ান। 'শালারা কোথায় কখন যায় না যায়, তার ঠিক কি?'

'দূর, দূর!' বলে হেসে উঠল মাহের। রাগ-বিরক্তি সব উবে গেছে মুহূর্তে। 'এখানে ওরা আসে না। কর্নেল হাজি কি বলেছে শোনোনি?'

'শুনেছি। তবু, বলা যায় নাকি?'

'যায়,' মৃদু গলায় বলল মাসুদ রানা। সবক'টা মুখ ঘুরল ওর দিকে। 'গার্ড হোক আর যে-ই হোক, যদি এদিকে এসেই থাকে, এমন রাতে ওদেরকেও টেন্টে আশ্রয় নিতে হবে।'

'তাতে কি?' চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করল আব্বাস।

সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল ও। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ওরা যদি আমাদেরটা দেখতে পায়, আমরাও ওদেরটা দেখতে পাব। কেউ যদি নিঃসন্দেহ হতে চাও, বাইরে থেকে ঘুরে এসো এক চক্কর।'

'আরে, তাই তো!' মানসিক প্রতিবন্ধীর মত হেসে উঠল জুবায়ের। 'কি বোকা! এই সোজা কথাটা একবারও মাথায় এল না কেন আমার?'

তার হাসিতে যোগ দিল সবাই। এমনকি রানাও।

'তবে একটা ব্যাপার আমাদের ফেভারে আছে,' আব্বাস বলল।

আতাসী মাথা ঝাঁকাল, 'কি?'

'ওদের জানা নেই ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি আমরা।'

মাহের হাসল দাঁত বের করে। 'তা বটে! গোটা একটা দেশের বিরুদ্ধে আমরা ছয়জন।'

'হ্যাঁ, তা···সংখ্যাটা একটু অসম হয়ে গেছে, নইলে···'

'ওটা পুষিয়ে নেব আমরা অয়েস্টার দিয়ে,' আব্বাস বলল। 'চিন্তা কোরো না।'

বাইরে কোথাও বিকট শব্দে বরফ ভেঙে পড়ার শব্দে চমকে উঠল প্রত্যেকে, কান পেতে তার গমগমে প্রতিধ্বনি শুনল। 'বাপরে!' শব্দ মিলিয়ে যেতে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল মসউদ, 'নিশ্চই আইফেল টাওয়ারের সাইজ ছিল ওটা।'

'হতে পারে,' সায় দিল পাশা।

আলোচনা থেমে গেল। কান পেতে বসে থাকল সবাই। টেনশন বাড়ছে দেখে রানা মৃদু গলায় বলল, 'বরফ কখনও স্থির থাকে না, সব সময় মুভমেন্টের ওপর থাকে। দিনে অন্তত দু'ফুট

মুভ করে, কাজেই ধস কখনও বন্ধ থাকে না। তবে সবচে' বিপজ্জনক সময় হলো ভোরবেলা, যখন সূর্য ওঠে। বরফের দেয়ালে কোথাও যদি খুঁত থাকে, সূর্যের ছোঁয়া পাওয়ামাত্র ভাঙন ধরে সেখানে।'

আবার ভাঙল বরফ, ধসের ধাক্কায় কেঁপে উঠল টেন্ট, রিজপোলে ঝোলানো হ্যারিকেন সিগন্যাল বাতির মত দুলতে লাগল। প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের মত একের পর এক প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল বাতাস যতক্ষণ না ঠেলে দূরে হটিয়ে দিল।

'ওয়েদার মনে হয় আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে,' আব্বাস মন্তব্য করল।

মাহের মাথা দোলাল, 'আমারও তাই মনে হয়।'

ফ্ল্যাপ উড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল এক ঝলক হিম বাতাস, এ-দেয়াল ও-দেয়ালে ঠোকর খেয়ে বেড়াল, দোল বেড়ে গেল হ্যারিকেনের।

ভোর হওয়ার এক ঘণ্টা আগে নাস্তা খেয়ে যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে নিল টীম, জিনিসপত্র সব স্লেজে তুলে বেঁধে ফেলা হলো। বাইরে এখন ভয়াবহ অবস্থা। বাতাসের হুঙ্কারে কান ঝালাপালা, এক হাত দূর থেকে গলা ফাটিয়ে চেচালেও কথা শোনা যায় না। তার ওপর রয়েছে তুষার বৃষ্টি, লম্বাটে আকৃতি নিয়ে কোনাকুনি ঝরছে তো ঝরছেই। চারদিক আঁধার করে রেখেছে, প্রায় কিছুই দেখার উপায় নেই।

ওর মধ্যেই সবাইকে বুটে ক্র্যাম্পন জুড়ে নেয়ার নির্দেশ দিল মাসুদ রানা। নিজেও লাগাল। তারপর প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে দড়ি, হ্যান্ড উইঞ্চ ইত্যাদি প্রস্তুত রেখে স্লেজ ঠেলে নিচের

আইসফলের ঠোঁট পর্যন্ত পৌছল অনেক কষ্টে। ততক্ষণে বেলা হয়ে গেছে বেশ, সূর্যের দেখা নেই যদিও। তবে বাতাসের বেগ খানিকটা কমেছে মনে হলো রানার, তুষারপাতের পরিমাণও। অন্তত ভোরের সেই বেগ নেই।

বিনকিউলার বের করে নিচে তাকাল ও, গিরিখাতের দিকে। কিছুই প্রায় দেখা গেল না, এখনও ওখানে রাতের মত অন্ধকার। আইসফল ধরে খুব ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে চলল ওর দৃষ্টি। বরফের মাঝে দুটো গভীর নালা দেখতে পেল ও, আইসফলের দু'দিক দিয়ে নেমে গেছে গিরিখাতে, তার শেষ কোথায় দেখার উপায় নেই। গিরিখাতের নদীটা দেখার অনেক চেষ্টা করল রানা, কাজ হলো না।

কি করে ওর মধ্যে নামা সম্ভব, ভাবতে গিয়ে হতাশ হয়ে উঠল মন, কিন্তু জোর করে ভাবটাকে দমন করল রানা। না নেমে উপায় নেই, নামতেই হবে, কাজেই নেতিবাচক চিন্তা করলে চলবে না। নজর একটু একটু করে ওপরে তুলতে শুরু করল ও, নিজে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেই পর্যন্ত তুলল। ফলের ওপরের রিজে বরফের বিশাল একেকটা চাকা ঝুলে থাকতে দেখল। তার সঙ্গে ঝুলন্ত গ্লেসিয়ার, বোল্ডার, স্ল্যাব, টাওয়ার, বরফের হাজারও আকার-আকৃতির শিরা, উপশিরা, দাঁড়া, আরও কত কী!

এক সময় গ্লাসটা চামড়ার কেসে পুরে ঘুরে দাঁড়াল ও। গিরিখাত ইঙ্গিত করে বলল, 'চিন্তার কোন কারণ নেই। আমাদের সুবিধের জন্যে সিঁড়ি আছে ওখানে, ধাপগুলো একটু বড়, এই যা।'

নাইলন দড়ির কয়েলের এক মাথা তুলে নিল ও, অন্য মাথা ছুঁড়ে দিল সাদিক মাহেরের দিকে। 'ধীরেসুস্থে নামব আমরা।'

দিনের শেষে মাত্র পাঁচশো ফুট নামতে পারল ওরা। তাও একটা

স্লেজ নামানো সম্ভব হলো, অন্যটা ওপরে গাছের সাথে বেঁধে রেখে আসতে হলো। সারাদিনে মুহূর্তের জন্যেও সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। নতুন আশ্রয় খুঁজে নিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁবু খাটানো হলো। অমানুষিক পরিশ্রমে ভীষণ কান্ত সবাই, যত বেশিক্ষণ সম্ভব বিশ্রাম নিতে হবে।

রান্নার আয়োজন চলছে দেখে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা, নিচে যতদূর দেখা যায়, পাথরের তাক পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। অসহ্য ঠাণ্ডা। বাতাসের গর্জনে থেকে থেকে শিউরে উঠছে আপাদমস্তক। একেকসময় মনে হতে লাগল এ জায়গা নিশ্চয়ই পৃথিবীতে নয়, ভুল করে অন্য কোন গ্রহে চলে এসেছে ওরা।

পিছন থেকে মাহেরের গলা শোনা গেল, 'জায়গাটা একেবারেই সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার, মেজর,' বলল সে।

শ্রাগ করল রানা। 'কি আর করা!'

'রাতে যদি আমাদের নিয়ে খসে পড়ে বরফ?'

মুখ খোলার আগে চারদিক ভাল করে দেখে নিল ও। জায়গা বাছাই করতে যথেষ্ট সময় নিয়েছে রানা, দু'পাশে খাড়া পাথরের দেয়াল, মাথার ওপরে গ্লেসিয়ারের নিরেট বরফের ছাদ দেখে নিরাপদ হবে জেনেই এখানে তাঁবু খাটাতে নির্দেশ দিয়েছে। কাজেই দুশ্চিন্তার কিছু দেখল না।

'ভয় নেই, পড়বে না,' বলল ও।

'কিন্তু আমার মনে হয় এখানকার বরফও মুভ করছে,' একটা সিগারেট ধরাল মাহের।

জবাব দিল না ও।

ছয়

টেন্টে ফিরে খেয়ে নিল রানা, ঢুকে পড়ল স্লীপিং ব্যাগের ভেতর। মনে মনে প্রার্থনা করছে এই জায়গার বরফ যেন স্থির থাকে, অন্তত আজকের রাতটা যেন না নড়ে। যদি নড়ে, যদি ওপরের নিরেট ওভারহ্যাং খসে পড়ে, অন্তত কয়েকশো মন বরফের তলায় কবর হয়ে যাবে ওদের সবার।

চারদিক থেকে নানান শব্দ আসছে কানে। বাতাসের, বরফের ফাটল জোড়া লাগার, নতুন ফাটল সৃষ্টি হওয়ার, আরও কত কিছুর। সবগুলোই দূরাগত বন্দুকের আওয়াজের মত শোনাচ্ছে। রাত যত বাড়ছে, শব্দও বাড়ছে তত। একের পর এক সিগারেট টেনে চলেছে রানা, ঘুম আসছে না। কারোই আসছে না। ব্যাগের মধ্যে ঘন ঘন নড়ছে সবাই।

প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে আজ ওদের ওপর দিয়ে, অথচ সেই তুলনায় কাজ তেমন এগোয়নি। মূল সমস্যা বাধিয়েছে স্লেজ, সারাদিনে মাত্র একটাকে অনেক কষ্টে নামানো গেছে। তৃতীয় অয়েস্টার ও ট্র্যাঙ্গিভারসহ অন্যটা রয়ে গেছে ওপরে।

প্ল্যান ছিল দড়ি দিয়ে বেঁধে হ্যান্ড উইঞ্চের সাহায্যে এক ধাপ এক ধাপ করে নামানো হবে ওগুলো, দিনের শেষে আইসফলের গোড়ায় পৌঁছে যাবে দল। হয়নি তা। একটাকে বহু কষ্টে নামানো গেছে, তাও মাত্র পাঁচশো ফুট পর্যন্ত। এর আসল কারণ প্রচণ্ড

শীতে খুব দ্রুত শক্তি হারাচ্ছে দলের সবাই। এই ব্যাপারটা নিয়ে যাত্রা করার আগে মাথা ঘামায়নি কেউ, এখন তার মাশুল গুনতে হচ্ছে। অবশ্য বাতাসের বেগ একটু কম থাকলে এত সমস্যা হত না।

স্লেজ নামানোর আগে তার প্রাউর সাথে বাড়তি দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল নিচে, প্ল্যান ছিল ওটা নিচ থেকে ধরে রাখবে দু'জন, যাতে নামার সময় স্লেজের অতিরিক্ত দোল ঠেকাতে পারে তারা। কাজ হয়নি। বাতাসের তোড়ে স্লেজ আর মানুষ, সবার উড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল। ওর মধ্যেই অনেক কষ্টে একটা নামিয়েছে ওরা। পরে আর ঝুঁকি নিতে সাহস হয়নি রানার দুর্ঘটনার কথা ভেবে।

খোঁচা খোঁচা দাড়িভর্তি গাল চুলকাল ও। ভাবছে। কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, ধাতব ঠং-ঠং শব্দে ধ্যান ভাঙল রানার, ঘুরে তাকাল। দেখতে পেল নিজের ব্যাকপ্যাক খুলে ঝুঁকে কি যেন করছে সাদিক মাহের। হ্যারিকেনের আলোয় কিছু একটা ঝিকিয়ে উঠল তার হাতে।

'কি ওটা?' প্রশ্ন করল ও।

'রেজর। শেভিং রেজর,' কাজের ফাঁকে বলল যুবক।

'শেভিং রেজর? এখন কি হবে রেজর দিয়ে?'

হাসির ভঙ্গি করল সে। 'দাড়ি রাখার অভ্যেস নেই, গাল চুলকাচ্ছে খুব। তাই শেভ করে নেব ভাবছি।'

'ওরে বাবা!' হঠাৎ ওপাশ থেকে আব্বাস বলে উঠল। 'এতগুলো রেজর কেন?'

'এগুলো আমার বাবার দেয়া উপহার,' গর্ব ফুটল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে। 'ইংল্যান্ড থেকে কিনে দিয়েছেন।' আট বাই আট চামড়ার একটা বাক্স তুলে সবাইকে দেখাল। 'মোট আটটা আছে.

প্রতিদিনের শেভের জন্যে আলাদা আলাদা।'

'দেখতে পারি?' হাত বাড়াল রানা।

নীরবে বক্স এগিয়ে দিল মাহের।

ওটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ও, বুঝল যথেষ্ট দামী জিনিস। হাতীর দাঁতের হাতল প্রত্যেকটা রেজরের। ব্লেড ঝকঝকে, তাতে গভীর ছাপে লেখা: শেফিল্ড। ভেতরে লাল ভেলভেটের সাতটা খোপ, প্রতিটা খোপে শুয়ে আছে একটা করে। অষ্টম রেজরটার খোপ ঢাকনার ভেতর দিকে। একটা রেজর হাতে নিয়ে দেখল রানা, বেশ ভারী।

'প্রতিদিনের শেভের জন্যে একটা করে?' বলল ও।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে অষ্টমটা?'

'ওহ্, ওটা? ওটা ফ্রী দিয়েছে, বোনাস হিসেবে।'

বক্স ফিরিয়ে দিল রানা। ভুলে গেল ওগুলোর কথা।

খুব ভোরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রানার। কেন ভাঙল, বুঝতে পারল না ও কিছুক্ষণ। কোন শব্দ হয়েছে? কোন বিপদের আভাস··· ভাবনাটা শেষ হওয়ার আগেই চট্ করে বুঝে ফেলল ব্যাপার।

আসলে বাতাসের হুঙ্কার থেমে গেছে বাইরে। কোন আওয়াজ নেই, একদম চুপচাপ। এই গভীর নৈঃশব্দই ওর ঘুম ভাঙার কারণ। এক ঝটকায় উঠে বসল রানা, হাঁকডাক ছেড়ে ঘুম ভাঙাল সবার। দশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে টেন্ট ছাড়ল টীম, আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে তখন। বাতাস নেই বললেই চলে।

আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বুক কাঁপছে রানার। ও জানে, আবহাওয়া ভাল থাকার অর্থ সূর্য উঠবে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় প্রচুর তুষার পড়েছে, এবং সেসব ঠিকমত জমে বসতে পারেনি। কাজেই

সূর্যের ছোঁয়া পাওয়ামাত্র ব্যাপকভাবে ভাঙন ধরবে ওপরের আধা-নিরেট বরফে, চেহারাই বদলে যাবে গোটা এলাকার। তার আগেই যদি ওপর থেকে দ্বিতীয় স্লেজ নামিয়ে আনা সম্ভব না হয়, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

দ্রুত কাজে লেগে পড়ল ওরা। আগের দিন ওপরের লিপের কিনারার এক গাছে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা দড়ির সাহায্যে ওপরে উঠে পড়ল রানা, মাহের, আব্বাস ও মসউদ। আতাসী ও জুবায়ের নিচে রয়ে গেল। শত ব্যস্ততার মধ্যেও রানার মন পড়ে থাকল আকাশের দিকে। তবে শেষ পর্যন্ত ওর আশঙ্কা সত্যি হলো না, উঠল না সূর্য। একেবারে শেষ মুহূর্তে মত বদলে চেহারা আঁধার করে তুলল প্রকৃতি, বাতাস ছাড়ল একটু একটু, সেই সাথে কুয়াশা। ক্রমে ঘন হয়ে উঠতে লাগল তার পর্দা।

বেশ সহজেই কাজটা আজ শেষ করতে পারল ওরা, তাঁবুতে ফিরে নাস্তা খেয়ে তাঁবু গোটাল, রওনা হয়ে পড়ল আইসফলের উদ্দেশে। বারোটার একটু আগে থেমে জুবায়েরকে ট্র্যান্সিভার অন করার নির্দেশ দিল রানা। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল, কোন মেসেজ এল না।

দ্বিতীয় দিনের শেষে লিপ ও অধিত্যকার মধ্যেকার অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করে ঢালু এক নালার কাছে পৌঁছল মিশন ডুমসডে। স্লেজ বেঁধে তাঁবু খাড়া করল। তারপর দল থেকে আলাদা হয়ে পড়ল রানা। এগিয়ে গেল রিজের শেষ মাথার দিকে, যেখান থেকে ভেঙে নিচে পড়ে বরফ। উঁকি দিল, কম করেও এক হাজার ফুট খাড়া নেমে গেছে পাথরের দেয়াল, তারপর ঘন অন্ধকার। যতদূর দেখা যায় মসৃণ, প্রকাণ্ড মুক্তোর মত ঝলমল করছে অধিত্যকা, তারপর মিলিয়ে গেছে নিকষ আঁধারে। ওর মধ্যে দিয়ে গেছে নালাটা।

পিছনে ভারী বুটের আওয়াজ শুনল রানা, পরক্ষণে সিরিয়ান ক্যাপ্টেন সাদিক মাহেরের মন্তব্য। 'এই আইসফল থেকে বের হতে হবে আমাদের।'

ঘুরল রানা। দিনের শেষ আবছা আলোয় যুবককে ভীত মনে হলো। চকচক করছে ক্লীনশেভড্ মুখটা। 'দু'দিন কেটে গেল এখানে,' ওকে নীরব দেখে আবার বলল সে। অভিযোগের সুরে।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রানা।

'সবে অর্ধেক পথ এসেছি।'

এবার নীরবে মাথা দোলাল ও।

'তারমানে আরও দু'দিন লাগবে,' দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল ক্যাপ্টেন।

'অগ্রগতির হার এইরকম থাকলে লাগবে।'

চোখ নামিয়ে ফলের দিকে তাকিয়ে থাকল সে কিছুক্ষণ। আঁধার ফুঁড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা দৈত্যাকার মোমবাতির মত বরফের অসংখ্য টাওয়ার দেখল চোখ কুঁচকে। 'আর একদিনের মধ্যে এই জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার কোন পথ বের করুন দয়া করে, নইলে...'

'আমি সে চেষ্টা করছি,' দৃঢ় গলায় বাধা দিল ও।

'ওয়েদার এখন ভাল। আবার খারাপ হওয়ার আগে নিচে পৌঁছতে চাই আমি। শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগে।'

জবাব দিল না রানা।

'মসউদ দুর্বল হয়ে পড়েছে।'

'আমি জানি।'

'এই পরিবেশে দুর্বল মানুষ যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটিয়ে বসতে পারে,' থমথমে চেহারায় বলল মাহের।

জবাব না দিয়ে ফলের দিকে ঘুরল রানা। গ্লেসিয়ার ও

গিরিখাতের দিকে তাকাল। বুঝতে পারছে মানসিক চাপ বাড়ছে দলের সবার, অস্থিরতা বাড়ছে। প্রত্যেকে জানে জীবন এখন টিমটিমে সলতের আগায়, যে কোন মুহূর্তে দপ্ করে নিভে যেতে পারে।

'হ্যাঁ, পারে,' অবশেষে বলল ও। 'তেমন কিছু ঘটলে মোকাবিলা করতে হবে আমাদেরকে।'

মাথা দোলাল মাহের, কিন্তু চেহারার মেঘ কাটল না। 'আমরা চেষ্টা করলে স্লেজের ওজন কমাতে পারি।'

'কি করে?' চোখ কুঁচকে তাকে দেখল রানা।

'একটা বোমা আর ট্র্যান্সিভার ফেলে দিয়ে,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল যুবক। ক্র্যাম্পন লাগানো বুট দিয়ে ঠুকে তুষারে নকশা আঁকছে। 'মেইরনের মাথা ওড়াতে দুটো বোমাই যথেষ্ট মনে হয় আমার। আপনার হয় না?'

'হয়।'

'তাহলে? তাহলে কেন অনর্থক তিনটে টানছি আমরা? কেন অকাজের পিছনে শক্তি ক্ষয় করছি, কেন সময় নষ্ট করছি? কাজ যদি দুটোতেই হয়, একটা বোমা আর ট্রান্সিভার ফেলেই তো এগোতে পারি। কমসে কম একশো পাউন্ড বোঝা কমবে তাতে।'

'সরি, ক্যাপ্টেন। তোমার মত এত সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি না আমি। সিদ্ধান্ত...'

দ্রুত দুই পা এগোল যুবক। 'কেন পারছেন না?' ক্ষিপ্ত হয়ে পা ঠুকল। মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে হুইস্কির গন্ধ বেরোচ্ছে। 'পারছি না বললে তো কাজ হবে না! পথে যে দেরি হচ্ছে, এজন্যে ধরা পড়ে যেতে পারি আমরা। মৃত্যু হতে পারে আমাদের।'

'পারে,' আগের চেয়েও নিচু গলায় বলল রানা। 'পারে জেনেই এসেছি আমরা সবাই। কাপ্তেন, তোমার হুইস্কির ভাণ্ডার মনে

হচ্ছে অফুরন্ত, ব্যাপারটা কি? সময়ে-অসময়ে পান করছ তুমি, কোথায় পেয়েছ এত?'

রাগে চেহারা লাল হয়ে উঠল যুবকের। 'কোথায় পেয়েছি মানে? বলেছি তো কায়রো থেকে কিনে এনেছি। বলিনি?'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'হ্যাঁ। কিন্তু তাই বলে যখন-তখন মাতাল হয়ে অনর্থক বক্ বক্ করতে হবে, এমন তো কথা নেই। মনের চাপ কমাতে মাঝেমধ্যে এক-আধ চুমুক...'

'ব্যস্!' প্রচণ্ড রাগে চেহারা বিগড়ে গেল মাহেরের। আগুন ঝরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল অপলক। 'আপনি আমার একান্ত ব্যক্তিগত...'

'না!' চাপা, তবে দৃঢ় কণ্ঠে বাধা দিল ও। 'যে মুহূর্তে তুমি কায়রোর লেখক সঙ্ঘের কনফারেন্স রুমে ঢুকেছ, সেই মুহূর্ত থেকে তুমি তোমার অফিশিয়াল র‍্যাঙ্ক হারিয়েছ, ভুলে গেলে? তেমনি যে মুহূর্তে এই মিশনের একজন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছ, তখন থেকে ব্যক্তিগত অধিকারও। এখন তোমার বা আমার, কারও ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই। একটা টীম হয়ে কাজ করছি আমরা, একেকজন টীমের হাত, পা, মাথা। এক্ষেত্রে একজন সমস্যা বাধালে অন্যদেরও ভুগতে হবে, কাজেই টীমের মাথা হিসেবে ব্যাপারটা জানা দরকার আমার। বলো, ক'বোতল হুইস্কি আছে তোমার কাছে!'

ক্ষিপ্ত বাইসনের মত চেহারা হলো মাহেরের, মনে হলো এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে বুঝি ওর ওপর। কিন্তু তেমন কিছু করল না, জবাবও দিল না। ফুঁসছে।

'দলের কারও কাছে তোমাকে ছোট করতে চাই না আমি, তোমার ব্যাকপ্যাক সার্চ করার মত পরিস্থিতি তুমি ডেকে আনো, তাও চাই না,' বলে চলল রানা। চেহারা শীতল। 'যদি গোপনেই

জোগাড় করে থাকো ওসব, গোপনই রেখো। নইলে ঝামেলায় পড়বে। যখন-তখন ড্রিঙ্ক করা চলবে না। যদি নির্দেশ অমান্য করো, পরেরবার ওয়ার্নিং দেব না আমি।'

লোকটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল রানা, পাশ কাটিয়ে দৃঢ় পায়ে টেন্টের দিকে চলল। ঘাড় ঘুরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল মাহের। রাগ, ক্ষোভ আর ঘৃণায় দু'চোখ জ্বলছে ধক্-ধক্ করে।

সূর্য ওঠার একটু আগে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। বাইরের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল। আইসফলের ওপরে পুরু পর্দার মত ভাসছে কুয়াশা, ঠিকমত নজর চলে না। বেখেয়ালে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে বিষম খেল ও, গলায় কুয়াশা ঢুকে পড়ায়।

সামলে নিয়ে গ্লেসিয়ার দেখার চেষ্টা করল ও। দেখা গেল না, তুলযুক বা তার সঙ্গী, একটাকেও না। ওগুলোর গাঢ় রঙের হাঁটু দেখা যায় কেবল একটু একটু। ফিরে এল ও। নাস্তা, গরম চা খেয়ে তাঁবু গুটিয়ে তৈরি হয়ে নিল যাত্রার জন্যে। কিন্তু দেরি হয়ে গেল, সূর্য ওঠার দেড় ঘণ্টা পর একটু একটু করে পাতলা হতে শুরু করল কুয়াশা। অপেক্ষা করছে টীম।

স্লেজ প্রস্তুত, সময় কাটানোর জন্যে শেষবারের মত ওগুলোর চারদিকে এক চক্কর দিয়ে নিচ্ছে রানা। মাল বোঝাই দেয়ার সময় সমতা রক্ষা করা হয়েছে কি না দেখল, স্ট্র্যাপের বাঁধন টেনেটুনে দেখল। তারপর প্রথম স্লেজের সামনের দুই রানারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রাউ ধরে ওটাকে টানল। সন্তুষ্ট হয়ে নিজের অবস্থান থেকে রানার ও স্কির লেজের মাঝখানে ব্যবধান মেপে দেখল। এবারও সন্তুষ্ট হলো।

এক সময় কুয়াশার পর্দা খানিকটা ওপরে ভেসে উঠল, অধিত্যকার অনেকখানি স্পষ্ট চোখে পড়ল ওদের সবার।

গিরিখাতের ওপাশের তুষার ও বরফের স্ট্রীমও। তবে একই সঙ্গে তাপমাত্রাও কমতে শুরু করল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কুয়াশার স্তর ওপরে উঠে সূর্য আর ওদের মাঝে নতুন দেয়াল সৃষ্টি করায় দেখা দিয়েও আবার আড়ালে চলে গেছে সূর্য।

একটু সরে এসে একবার স্লেজ, একবার হাজার ফুট নিচে আইসফলের নালার দিকে তাকাতে লাগল রানা। সন্দেহ গাঢ় হচ্ছে, কারণ জায়গাটা আগের দিনের তুলনায় অনেক বিপজ্জনক মনে হচ্ছে। একটু এদিক-ওদিক হলেও পাথর আর বরফে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যেতে পারে স্লেজ, খাবার, টেন্ট, ফুয়েল, সব খোয়াতে হতে পারে। কি করা যায়? ভাবল ও।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, ঠিক তখনই সঙ্গীদের মুখগুলো আচমকা হলুদ হয়ে উঠল দেখে থেমে গেল। ঝপ্ করে নেমে এসেছে কুয়াশা, ঢেকে ফেলেছে ওদের। অধিত্যকা ও আইস স্ট্রীম নিমেষে হাওয়া। এবার আতঙ্ক গ্রাস করল রানাকে। বসে থাকা চলবে না, মনে মনে বলল ও। এগিয়ে যেতে হবে আমাদের, যে করে হোক এগিয়ে যেতে হবে। বসে বসে সময় নষ্ট করা চলবে না।

'স্কি পরে নাও সবাই,' কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ দিল ও। 'এরমধ্যেই রওনা হতে হবে। আজ একসঙ্গে যাব আমরা। পাশাপাশি।'

'কিন্তু···' কুয়াশার পর্দার দিকে তাকিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল ক্যাপ্টেন আব্বাস, আর কি বলবে ভেবে পেল না।

'কোন কিন্তু নেই। ওয়েদারের মেজাজ মর্জির ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না আমাদের, মুভ!'

দশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিল সবাই, দু'দলে ভাগ হয়ে দুই স্লেজের আগে-পিছে দাঁড়াল। 'লেট'স গো!' প্রথমটার প্রাউ ধরে ঠেলতে শুরু করল রানা। পিছনেরটার প্রাউ থেকে আতাসী

বলে উঠল, 'ফি আমানিল্লাহ্! গড়াতে শুরু করল রানার। খানিকদূর পর্যন্ত আস্তে ধীরে এগোল স্লেজ, তারপর গতি পেল।

রানার পিছনে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে, বাঁধনমুক্ত ক্ষিপ্ত ঘোড়ার বেগে ছুটছে স্লেজ। পাশে তাকাল ও এক ফাঁকে, দেখল আতাসীর স্লেজের গতি কমে গেল হঠাৎ করে। লাইন ছেড়ে বাঁ দিকে এগোল কিছুক্ষণ, তারপর ডানে ঘুরে গেল। অনেক কষ্টে ওটাকে লাইনে ফিরিয়ে আনল তিন কমান্ডো। কয়েক সেকেন্ডের অসতর্কতার ফলে এদিকে ওদেরটাও ঘুরে গেল বাঁয়ে, সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পোলের ধাক্কায় পথে নিয়ে এল রানা।

গতি আরও বাড়ল স্লেজের, রানারের গর্জনও। আতাসীর স্লেজ ফুট খানেক এগিয়ে গেছে, ওর ব্যাকপ্যাক ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে দেখল রানা। নাগরা জুতোর মত ওপরদিকে ভাঁজ হয়ে থাকা স্কির ডগা আলগা তুষার কাটছে, ঢেউয়ের মত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে গুঁড়ো পাউডার তুষার। বরফ আর অশুভ হলুদ আলোর এক টানেল ধরে ছুটছে ওরা, নালার মেঝেতে জমে থাকা কুয়াশার পর্দা ছিঁড়েখুঁড়ে।

দু'পাশের পাথুরে দেয়াল সমানগতিতে পিছনদিকে ছুটছে, কাঁপছে থরথর করে। সামনে কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না রানা, তবে ভরসা আছে বড় ধরনের বিপজ্জনক কোন বাধা পড়বে না। বরফ গলার সময় এলে এইসব পাহাড়ী নালাই ছোট ছোট নদীতে পরিণত হয়, তারওপর মেতুলায় সেদিন ক্যাপ্টেন আরিফ এটার ছবি দেখিয়েছে ওদের, তখন নিজেও দেখেনি সেরকম কিছু। কাজেই শঙ্কিত হওয়ার বিশেষ কারণ আছে বলে মনে হলো না ওর।

আরও কিছুটা এগিয়ে গেছে আতাসীর স্লেজ, ঘন ঘন ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে চলেছে। পোল চালনায় বেদুইনের সাথে সঙ্গতি

রাখার চেষ্টা করল রানা, এ ছাড়া করার কিছু নেইও এ মুহূর্তে। হঠাৎ করে নালা আরও ঢালু হয়ে যেতে গতি বেড়ে গেল স্লেজের, রানারের গর্জনও।

কিছুর সাথে বাড়ি খেয়ে গতি কমে গেল, লাফ দিল রানার স্লেজ, আবার ছুটল দুরন্তবেগে। জিভের গোড়ায় রক্তের আভাস টের পেল রানা, থুতু ফেলার জন্যে মুখ খুলল, হিম ঠাণ্ডা বাতাস তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত ঢুকে পড়ল ভেতরে, গলা ও ফুসফুস জ্বলে গেল। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল রানা, সামনের স্লেজের রানারের আঘাতে ছিটকে ওঠা খুদে কিছু বরফ উড়ে এসে ঠুক্-ঠুক্ শব্দে আছড়ে পড়ল দাঁতের ওপর।

একই মুহূর্তে এক ফালি আকাশ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। সামনে নজর দিল ও, অনেক নিচে মাটিতে ছড়ানো হাজারটা মুক্তোর ঝিলিক দেখে নজর ধাঁধিয়ে গেল। ওটা অধিত্যকা বুঝতে পেরে বুকের ভেতর চাপা উল্লাস অনুভব করল মাসুদ রানা। হঠাৎ করে লাট্টুর মত পাক্ খেতে শুরু করল দুই স্লেজ।

এক মুহূর্ত পর নালা ছেড়ে গোলার বেগে বেরিয়ে গেল আতাসীর স্লেজ, ঝলমলে সূর্যের আলোয় ঝিলিক মেরে উঠল ওটার চকচকে দেহ। কিছুর সাথে জোর গুঁতো খেল ওটা, একটা দেহ সূর্যের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি উড়ে যাচ্ছে দেখতে পেল রানা। পরমুহূর্তে একটা চিৎকার কানে এল।

রানার স্লেজও ঘুরে গেল, গতির তোড়ে কাত হয়ে পড়েই গেল। রানাও পড়ে গিয়েছিল, তবে দ্রুত সামলে নিয়ে উঠে পড়ল। দেখল গ্লেসিয়ার ব্যাঙ্কে বাড়ি খেয়েছে প্রথমটা, তার একটু দূরে আতাসীকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখে ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। কিন্তু না, মারাত্মক কিছু ঘটেনি ওর। বারকয়েক মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে বসল। ওর দিকে ফিরে হাসল বোকার মত। আশ্বস্ত

হয়ে নিজের স্লেজের দিকে তাকাল রানা।

মালপত্র সব ভেতরেই আছে দেখল, তবে পিছনের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে একটা। অ্যালুমিনিয়াম বডিতে সপাৎ-সপাৎ বাড়ি খাচ্ছে ত্রিপলের প্রান্ত। ওদিকে আতাসীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আব্বাস, জুবায়ের, মসউদ ও মাহের, পোলের ওপর দেহের ভর চাপিয়ে শব্দ করে হাঁপাচ্ছে। প্রথমে কয়েক সেকেন্ড নীরবে কেটে গেল, কথা নেই কারও মুখে।

স্লেজ দুটো দেখল সবাই, পিছনে ফেলে আসা পথ দেখল, আইসফল বেয়ে ওপরে উঠে গেল নজর, আবার ফিরে এল। পরস্পরের দিকে তাকাল, হেসে উঠল হঠাৎ করে। আব্বাস ঘুরে দাঁড়াল আইসফলের দিকে মুখ করে, ওটাকে লক্ষ করে তর্জনী তুলে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'পারলে না আমাদের ঠেকাতে! আমরা জিতে গেছি! তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি আমরা। পারলে না!'

সাদিক মাহেরকেও হাসতে দেখল রানা। উঠে স্লেজের কিনারায় বসল লেফটেন্যান্ট আতাসী, হাসির তোড়ে বেরিয়ে আসা চোখের পানি মুছছে।

খানিক বিশ্রাম করে স্লেজ ঠেলে অধিত্যকার কিনারায় নিয়ে এল ওরা। বাতাস এখন নেই, চারদিক একদম শান্ত। ঝলমল করছে সূর্য। ওদের নিচ দিয়ে রূপালী সাপের মত বয়ে চলেছে আইসফল ধরে নেমে আসা গ্লেসিয়ার স্ট্রীম, সামনের দিগন্তবিস্তৃত সাদা মাঠের বুক চিরে চলে গেছে দূরে, বহুদূরে। বরফ থেকে ওঠা বাষ্পের হালকা পর্দার ওপাশে।

সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। ইসরাইলে ঢুকে পড়েছে ডুমসডে মিশন। দূরের ওই পর্দাটার ওপাশেই কোথাও আছে জায়ন লেক।

সাত

মেতুলা। বেজের কমিউনিকেশন্‌স্ রুমের আধো আলো, আধো অন্ধকার পরিবেশে চারটে ছায়া-কাঠামো বসা। তাদের সামনে তিনটা স্যাটেলাইট ট্র্যান্সমিশন স্ক্রীন। তুলযুক পর্বতমালার ওপরে কোথাও আপন কক্ষপথে ঘুরছে এক রুশ স্যাটেলাইট, ওটার পাঠানো বার্তা ফুটে উঠছে সবার বড়টায়। কাঁচের স্ক্রীনে গাঢ় রঙের ছবি ফুটছে একের পর এক। নিবিষ্টমনে তা দেখছে চার কাঠামো।

বিশাল, মোটাসোটা একটা কাঠামো নড়ে উঠল। 'পাঁচদিন হয়ে গেল, এখনও কোন সিগন্যাল দিল না রানা। চিন্তার কথা।'

পাশের কাঠামোটা ঘুরল বক্তার দিকে। 'আমার তেমন মনে হয় না, জেনারেল।'

'হওয়া উচিত,' মাথা দোলালেন চিন্তিত, উদ্বিগ্ন আরাবী। 'এতদিনে নিশ্চই রেশন ফুরিয়ে গেছে ওদের।'

শ্রাগ করল অন্যজন, কর্নেল হাজি। 'কমপো রেশন শেষ হয়ে গেলেও অ্যাসল্ট রেশন আছে।'

'পরিমাণ কেমন?'

'মথাপিছু দু'পাউন্ড প্রতিদিন।'

'পর্যাপ্ত মনে হচ্ছে না শুনে।'

'আমার মনে হয়,' তৃতীয় কাঠামোর গলা শোনা গেল এবার, 'ওদিকের ওয়েদার খারাপ বলে সিগন্যাল পাঠাতে পারছে না ওরা।'

'হতে পারে, স্যার,' আল সাউদকে সমর্থন জানাল কর্নেল। পরক্ষণে স্ক্রীনের ওপর ঝুঁকে পড়ল। 'ওটা মনে হয়...' থেমে গেল।

'কি?' একযোগে প্রশ্ন করলেন আরাবী ও সাউদ।

চতুর্থ কাঠামোর দিকে হাত বাড়াল কর্নেল। 'ক্যাপ্টেন, টাইটার স্কেল দাও, কুইক।'

হাত বাড়িয়ে স্ক্রীনের পাশের এক সুইচ টিপে দিল হাজি, ছবিটা বড় পর্দা ছেড়ে পাশের ছোট একটায় ফুটল। ওটার আরেক সুইচ টিপে ছবি স্টিল করে দিল সে। আরেকটা টিপে ম্যাগনিফাই করল ওটা, তারপর আরিফের স্কেল নিয়ে পর্দায় কিছু মাপজোক করল। কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল সেদিকে।

'কি হলো?' উদ্বেগ ফুটল আরাবীর গলায়।

'চুক' করে বিরক্তিসূচক শব্দ করল কর্নেল। 'এখানে একটা পিলবক্স দেখতে পাচ্ছি, জেনারেল। নতুন। ঠিক মিশনের পথের ওপর। মুশকিল! নাগিবের ম্যাপে তো ছিল না এটা!'

বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে সেই একই পিলবক্সের দিকে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। কপাল কুঁচকে আছে চিন্তায়। জানে, ওটার থাকার কথা নয়। নাগিবের জানা থাকত তাহলে ব্যাপারটা, তার আঁকা ম্যাপেও দেখানো হত। কিন্তু নেই, ম্যাপে উল্লেখ নেই ওই বক্সের। অর্থাৎ এটার খবর জানা নেই তার বা কর্নেল হাজির। নতুন মাল। ইসরাইলের পাঁচ মাইল ভেতরে ঢুকে পড়েছে ওরা, লেক আর তিন মাইল সামনে এমন সময় চোখে পড়ল ওটা। তাও ভাল, সময় থাকতে পড়েছে।

রানার মুখে নতুন পিলবক্সের কথা শুনে সবার চেহারায় নানান ভাবের খেলা খেলে গেল—বিস্ময় ভয় আর অস্বস্তির। কিন্তু আতাসী নির্বিকার, বরং কঠোর হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'যে ভয়ঙ্কর

বিপদের মধ্যে দিয়ে এ পর্যন্ত এলাম, সে তুলনায় ওরকম দুটো কেন, চারটে পিলবক্সও কিছু না, বস্,' বলল সে গম্ভীর গলায়। 'তুলযুক ঠেকাতে পারেনি আমাদের, ওরাও পারবে না।'

নতুন করে বক্স পর্যবেক্ষণে মন দিল রানা। ওটার এপাশের দেয়ালে ডাকবাক্সের মত সরু, আড়াআড়ি একটা ফাঁক দেখল। ভেতর থেকে মেশিনগানের সাহায্যে ভ্যালি গার্ড দেয়ার জন্যে রয়েছে ওটা। বক্সের পিছনে কংক্রীট বেজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা কাঠের হাট, ছাদ ফুঁড়ে উঠে গেছে লম্বা রেডিও অ্যান্টেনা। সূর্যের আলোয় চকচক করছে তার ধাতব দেহ।

'কেউ নেই ভেতরে,' বিনকিউলার নামিয়ে বলল রানা।

'হয়তো খালি বক্স, এখনও গার্ড পোস্টিং দেয়া হয়নি,' আব্বাস মন্তব্য করল।

'হয়েছে,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল আতাসী। 'ওই যে!'

ওর দিক নির্দেশ অনুসরণ করে তাকাল রানা। বক্সের পুবদিকে চারটা খুদে কাঠামো দেখতে পেল। র‍্যাকেট পরে আছে মানুষগুলো, তুষারে ঢেউ তুলে একটা ঢাল বেয়ে পুব থেকে বক্সের দিকে এগোচ্ছে স্কি করে। ক্রমে বড় হলো কাঠামোগুলো, পৌঁছে গেল বক্সে। লোকগুলোর পরনে ধূসর-সবুজ প্যাডেড টিউনিক। কাঁধে চকচক করছে উজি।

'এখানে তাঁবু খাটানোর উপায় নেই,' বলল ও। 'পিছিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

এক মাইল পিছনে ফেলে আসা একটা ছোট পাহাড় দেখাল। 'ওটার আড়ালে।'

বড় বড় কনিকার ঝোপের আড়ালে আড়ালে পিছিয়ে এল ওরা, পাহাড়ের আড়ালে তাঁবু খাড়া করল। লাঞ্চ খেয়ে গরম চায়ে চুমুক দিল। 'রেশন কিরকম আছে, মেজর?' প্রশ্ন করল আব্বাস।

'বেশি না।'

'কতদিন চলবে?'

দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। 'একদিন।'

'মাত্র একদিন!' মাহের বলে উঠল।

'হ্যাঁ।'

অনেকক্ষণ কথা নেই কারও মুখে। 'তাহলে কি হবে?' সার্জেন্ট জুবায়ের বলল। দুশ্চিন্তায় চেহারা কালো।

জবাব না দিয়ে ম্যাপ মেলে ঝুঁকে বসল রানা। খোঁচা লাগাল মাহের, 'ম্যাপ খেয়ে তো পেট ভরবে না আমাদের!'

কানে তুলল না ও, লাল রঙের এক বৃত্তের ওপর টোকা দিল। 'এই হচ্ছে সেই গ্রাম, তিলাত। আমাদের পাঁচ মাইল উত্তর-পুবে।'

'কি করে বুঝব দূরত্বের হিসেব ঠিক আছে?' মাহের বলল।

'না থাকার কোন কারণ দেখি না। এ পর্যন্ত সব ঠিকই আছে। রুট, ল্যান্ডমার্ক, নেভিগেশন...'

'এই পিলবক্সটা নেই।'

'হতে পারে ওটা নতুন। আর এই ম্যাপ নাগিবের এক মাস আগে শেষ সফরের ওপর ভিত্তি করে আঁকা।'

'না হয় বুঝলাম গ্রামটা আছে, গেলে খাবারও পাওয়া যাবে, কিন্তু অত কষ্ট করার দরকার কি?' বলল মাহের।

চোখ তুলল রানা। 'মানে?'

'তিলাত পাঁচ মাইল দূরে, পিলবক্স চার মাইল। ওখানেও খাবারের মজুদ আছে, ওখান থেকে যদি...'

'চারজন সৈন্যও আছে ওখানে,' তাকে বাধা দিয়ে আতাসী বলল।

'সো হোয়াট! ওরা চার, আমরা ছয়। কিছু টের পাওয়ার আগেই ওদের খতম করে দিতে পারব আমরা।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' জর্ডানিয়ান মসউদ মাথা দোলাল।

ওদের দুজনকে ঠাণ্ডা চোখে দেখল মাসুদ রানা। 'বাজে আলাপ বন্ধ করো! আমরা রেইড করতে আসিনি, এসেছি সিক্রেট মিশন নিয়ে। গোপনে ঢুকেছি, কাজ সেরে আবার গোপনেই ফিরে যেতে হবে। ভুলে যেয়ো না ওদের হাটে রেডিও আছে। তার মানে বেজের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলে ওরা।'

'তাতে কি?' ভালমানুষের মত প্রশ্ন করল মাহের।

'তাতে এই, সময়মত বেজ যদি এদের সাড়া না পায়, বড় সার্চ পার্টি পাঠাবে। আমাদের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যাবে।'

'আমি তা মনে করি না,' মাথা নাড়ল যুবক। 'এটা বিপজ্জনক জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। বেজ ধরে নেবে বর্ডারে টহল দিতে গিয়ে বরফচাপা পড়ে মরেছে ওরা। আর আমরাও কচিখোকা নই যে ওদের মেরে খোলা জায়গায় ফেলে সার্চ পার্টির অপেক্ষায় ওদের পাশে বসে থাকব। লাশগুলো দূরে কোথাও কবর দিয়ে খাবার নিয়ে সরে পড়ব, ব্যস্!'

'আবারও অনধিকার চর্চা করছ তুমি, ক্যাপ্টেন!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রানা। 'সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করছ!'

'এতে দোষের কি আছে, মেজর,' মৃদু গলায় মসউদ বলল। 'দলের সবার স্বার্থে কেউ যদি ভাল পরামর্শ দেয়, ক্ষতি কি?'

মুখ খোলার আগে একে একে সবাইকে দেখে নিল ও। চেহারায় ভয়ঙ্কর ঝড়ের পূর্বাভাস। 'রুল নাম্বার এক, এখন থেকে, আমি না চাওয়া পর্যন্ত কেউ সেধে মিশন সম্পর্কে কোন পরামর্শ দিতে আসবে না আমাকে। রুল দুই, মিশনের যে কোন ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, এবং তা বিনা প্রশ্নে মেনে চলতে হবে সবাইকে। গট দ্যাট?'

জবাব দিল না কেউ। নীরবে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

রানার নজর মসউদের ওপর স্থির হলো। 'একজন হুজুগে পরামর্শ দিল, অমনি তার হয়ে ওকালতি শুরু করে দিলে। বলো দেখি, সার্চ পার্টি এসে গার্ডদের পেল না, ওদের রেশনেও পেল না, কি ধরে নেবে তখন?'

নজর নামিয়ে নিল যুবক।

'তোমরা কেউ বলতে পারো?' অন্যদের উদ্দেশ্যে বলল রানা।

জবাব এল না। সবাই চুপ।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল রানার। আতাসী, জুবায়ের ও আব্বাসকে যার যার স্লীপিং ব্যাগে দেখল ও, অন্য দুটো ব্যাগ খালি। মাহের ও মসউদ নেই। আতঙ্কে জমে বসে থাকল রানা কয়েক মুহূর্ত, মাথায় যে দুশ্চিন্তা চলছে, মন তা মেনে নিতে না চাইলেও কি করে যেন বুঝে ফেলল, সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে গেছে।

উঠে পড়ল ব্যস্ত হয়ে। দেখল ওদের দুই ব্যাগের পাশে রাইফেল রাখার জায়গা খালি। নেই ওগুলো। মাহেরের ব্যাকপ্যাক থেকে রেজরের বক্সটা উঁকি দিচ্ছে দেখে তুলে নিল রানা।

ভেতরে অষ্টম রেজরটা নেই।

ওরা যখন পিলবক্সের কাছে পৌঁছল, মাহের ও মসউদ তখন খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। এক ইসরাইলী সৈন্যের লাশ ওদের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে আছে, মুখের প্রায় পুরোটাই ডুবে আছে তুষারে। লাশের পাশে স্তূপ হয়ে আছে প্রচুর টিনড ফুড।

স্কি খুলে মাহেরের মুখোমুখি হলো রানা, তারপর মারল মনের সমস্ত ঝাল মিটিয়ে। প্রথম হেভিওয়েট পাঞ্চটা মারল তার বাঁ চোয়ালে, হাড়ের সাথে হাড়ের সংঘর্ষের ভয়াবহ শব্দ উঠল। গুঙিয়ে উঠে তিন পা পিছিয়ে গেল মাহের। জানত সমস্যা হবে, কিন্তু তা যে এত দ্রুত হবে, বোঝেনি। বিস্মিত হওয়ার সময়টাও পেল না

সে।

ফাঁকটা দ্রুত পূরণ করল রানা, পরের বাঁ হাতি ঘুসিটা মারল তার সোলার প্লেক্সাসে। 'হুঁক!' করে উঠল ক্যাপ্টেন, তুষারে পা হড়কে গেল, পড়ে গেল চিত হয়ে। এক ধাক্কায় বুকের সমস্ত বাতাস খালি হয়ে যেতে হাঁ করে দম নেয়ার কসরত করতে করতে উঠে বসার চেষ্টা করল। ব্যথায় মুখ নীল হয়ে গেছে, ফুলে উঠেছে গলার রগ। আবার এগোল রানা, দুই হাতে পারকার বুকের কাছে মুঠো করে ধরে হ্যাঁচকা টানে হুঁশজ্ঞানহীন যুবককে টেনে তুলল, পরমুহূর্তে নির্দয়ের মত হাত চালাল আবার। কিডনি ও থুতনিতে পরপর দুটো বিদ্যুৎগতির পাঞ্চ খেয়ে উড়ে গেল মাহের, নরম তুষারে আছড়ে পড়ে সরসর করে কয়েক ফুট পিছিয়ে গিয়ে স্থির হল। জ্ঞান হারিয়েছে। ঠোঁটের কোণে জমাট বেঁধে আছে রক্ত।

এতকিছু ঘটতে ত্রিশ সেকেন্ড সময়ও লাগল না। ওদিকে সঙ্গীর অবস্থা দেখে ভয়ে মুখ চুন হয়ে গেছে মসউদের। মাহেরকে ছেড়ে রানাকে ওর দিকে এগোতে দেখে আঁতকে উঠল সে, দ্রুত পিছাতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেল। কিন্তু পুরো পড়ার আগেই পাশ থেকে সাঁৎ করে হাত বাড়াল আতাসী, ঘাড়ের কাছে পারকা খাবলা মেরে ধরে খাড়া করে ফেলল। আব্বাস ও জুবায়ের কয়েক গজ তফাতে দাঁড়িয়ে হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। নড়তেও ভুলে গেছে।

কয়েক দীর্ঘ পদক্ষেপে মসউদের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। কয়েক মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থাকল। ওতেই কাজ হয়ে গেল তার, আতঙ্কে চোখ উল্টে যাওয়ার দশা। ওদিকে আতাসী তখনও ধরে রেখেছে, মারের হাত থেকে বাঁচার যে চেষ্টা করবে, সে পথও নেই তার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ভেবে মারল না রানা।

'কেন করলে কাজটা?' নিরুপায় কণ্ঠে বলল ও। 'কেন করলে

এমন সর্বনাশা কাজ! মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে নিষেধ করেছিলাম আমি। এখন যদি এদের বেজ থেকে সার্চ পার্টি আসে, কি হবে তখন?'

মুখের সামনে দু'হাত তুলে নাড়তে লাগল মসউদ, চিঁ-চিঁ করে বলতে লাগল, 'আমি করিনি, মেজর! আল্লার কসম, আমি করিনি। আমি এসেছি...' থেমে সশব্দে ঢোক গিলল সে।

'বাদ্য বাজাতে, কেমন?' বলল আতাসী। পারকা ধরে জোর এক ঝাঁকি দিল তাকে।

'না! মাহের বলেছিল গার্ডদের ঘুমের সুযোগে কিছু...' আরেক ঢোক গিলল মসউদ, 'কিছু খাবার চুরি করে...তাই এসেছি। কিন্তু, কিন্তু এক গার্ড জেগে ছিল। সে চ্যালেঞ্জ করতে আর কোন উপায় না দেখে গুলি করে ও। তারপর...তারপর, আমি নিষেধ করেছি। ও শোনেনি।'

'কতজন ছিল গার্ড?' প্রায় স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল রানা। সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে গেছে, এখন রাগ দেখিয়ে কোনও লাভ নেই জেনে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

'চা-চারজন।'

'বাকি তিনজন কোথায়? সবাইকে...?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল মসউদ। 'হ্যাঁ। ওরা...ওরা পিলবক্সের ভেতরে আছে।'

খুব দ্রুত পরবর্তী করণীয় ঠিক করে ফেলল রানা। আতাসীকে বলল ওকে ছেড়ে মাহেরের জ্ঞান ফেরাবার ব্যবস্থা করতে। 'ওর রাইফেল, গুলি, আর যা যা আছে, সব সীজ করো। জুবায়ের, লেফটেন্যান্টকে সাহায্য করো। তুমি আমার সঙ্গে এসো,' শেষের কথাটা ক্যাপ্টেন আব্বাসের উদ্দেশে বলল রানা। সঙ্গে সঙ্গে দম দেয়া পুতুলের মত এগোল ওরা।

খুব দ্রুত এখান থেকে সরে পড়ার তাগিদ অনুভব করল রানা, তাই বাইরে পড়ে থাকা লাশটার দিকে একবারের বেশি তাকাল না, ব্যস্ত পায়ে বাক্সের দিকে এগোল। ভেতরটা বেশ গরম। একটা কেরোসিন স্টোভ উত্তাপ ছড়াচ্ছে। সরু নাইলনের দড়ির সাথে ঝুলছে কয়েক জোড়া ভেজা মোজা। বাতাসে রক্তের গন্ধ। দরজার একটু ভেতরে পড়ে আছে তিন গার্ডের লাশ।

দু'জনের চেহারা তোবড়ানো, রক্তাক্ত। চেনার উপায় নেই। খুব সম্ভব মাহেরের রাইফেলের বাঁটের কীর্তি। গলা হাঁ হয়ে আছে সবার—জবাই করা হয়েছে। ঝুঁকে মুখগুলো দেখল ও। একদম অল্পবয়সী সবাই, সতেরো-আঠারোর বেশি হবে না কিছুতেই। পিছনে আব্বাসকে 'ওয়াক্!' করে উঠতে শুনল রানা, নিজের পেটের মধ্যেও পাক্ দিচ্ছে।

বমি হয়ে যাওয়ার আগেই বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুরল ও, তখনই চোখ পড়ল জিনিসটার ওপর। হাটের এক কোনায় টেবিলের ওপর রাখা আছে একটা ট্র্যান্সিভার, ওটার মাঝখানের লাল কাঁচের চোখটা টিপ্‌টিপ্ করছে। এই শুরু হলো, মনে মনে বলল রানা। ঘুরে আব্বাসকে ইঙ্গিতে দেখাল জিনিসটা। 'দেখো!'

দু'জনে অপলক তাকিয়ে থাকল টকটকে লাল চোখটার দিকে। একটু পর কল-সাইন শোনা গেল, এ প্রান্তের সাড়া না পেয়ে বারবার বাজতে থাকল। তারপর থেমে গেল একসময়।

'এখনই রওনা হবে ওরা!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা। 'পালাতে হবে। এসো!'

দ্রুত হাত চালিয়ে লাশগুলো কবর দিল ওরা বরফ খুঁড়ে। সাথে স্কি, পোল, রাইফেল, প্যাক, র‍্যাকেট, সব। যদিও সন্তুষ্ট হতে পারল না রানা। কারণ জানে, ওগুলো খুঁজে বের করতে আধ ঘণ্টাও লাগবে না সার্চ পার্টির।

এরপর হাটের কংক্রীটের মেঝেতে কেরোসিন ঢেলে রক্তের দাগ মুছল ওরা, তারপর কিছু ক্যান বাদে বাকি সব সাজিয়ে রাখল মসউদের দেখানো জায়গায়। সমস্ত কাজ তাকে ও মাহেরকে ছাড়াই শেষ করা হলো, দূর থেকে নীরবে দেখে গেল ওরা। বক্সের ভেতরে সন্দেহজনক কিছু রয়ে গেছে কি না শেষবারের মত দেখে নিল রানা।

আছে। রক্ত আর কেরোসিনের কড়া গন্ধ পুরো দূর হয়নি। হয়তো সার্চ পার্টি গন্ধটা পাবে, কিন্তু কিছু করার দেখল না ও। কাজেই পিছিয়ে এল, তুষারে নিজেদের উপস্থিতির ছাপ মুছে পিছাতে শুরু করল একটু একটু করে। অবশেষে ঘুরপথে ছুটল। এবারও ডাকা হলো না মাহের বা মসউদকে, নিজেদের গরজেই মূল দলকে অনুসরণ করল ওরা। পায়ের ছাপ মুছতে ভুলল না।

রানা যা ভেবেছিল, তারচেয়ে অনেক দ্রুত পৌঁছে গেল ইসরাইলী সার্চ পার্টি। তুষারমোড়া উপত্যকার ওপর দিয়ে স্কি করে তুফান বেগে ছুটে এল আটজন। কালো ড্রেস পরা, স্কি ছোটানো ও পোল চালনায় নিখুঁত সঙ্গতি ওদের। ধপধপে সাদার ওপর দিয়ে বড়সড় কালো গুবরে পোকার মত লাগছে দেখতে।

সবার পিঠে একটা করে উজি, ব্যাকপ্যাক ও মেশিনগানের বিযুক্ত পার্টস। দলের নেতৃত্বে আছে এক লেফটেন্যান্ট। ইসরাইলের সেকেন্ড মাউন্টেন ডিভিশনের সৈনিক ওরা, হাই-আল্টিচিউডে অভ্যস্ত। পাথরের মত কঠিন হৃদয়ের নির্দয়, ভয়ঙ্কর মানুষ একেকজন।

পিলবক্সের সামনে পৌঁছে স্কি খুলে ফেলল সবাই, ওগুলো পাশাপাশি দুই পিরামিডের মত খাড়া করে রাখল। তারপর পিলবক্সে ঢুকল অফিসার, ভেতরে এক পলক নজর বুলিয়ে চলে

এল হাটে। ট্রান্সিভারের সাহায্যে নিজের উপস্থিতির কথা বেজকে জানাল, ওটা সেরে মন দিল হাট পরীক্ষার কাজে।

দড়িতে ঝোলানো কয়েক জোড়া মোজা দেখল সে, লকারে শার্ট ও উলেন জামা দেখল। চারটা বেডই গোছানো, কম্বল ভাঁজ করে জায়গামত রাখা। তার ওপর রাখা আছে বালিশ। দেখে মনে হয় ভোরে গোছগাছ করে টহলে গেছে দলটা। কিন্তু অফিসারের তা মনে হলো না। কারণ যেখানেই যাক্, বেজের সাথে যোগাযোগের নির্দিষ্ট সময় ওঁদের এখানে থাকার কথা, এবং আজই প্রথম সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। কেন? ভাবতে লাগল সে। গেল কোথায় সবাই?

এক বাঙ্কে বসে পকেট থেকে কিছু ডকুমেন্টস বের করে তাতে চোখ বোলাতে লাগল। এখানকার চার গার্ডের বিস্তারিত রেকর্ড। ওগুলো পড়ল লেফটেন্যান্ট, জানতে পারল ওরা সবাই অল্পবয়সী, কিন্তু যথেষ্ট অভিজ্ঞ। এই অঞ্চলের সবকিছু চেনে, অতএব পথ হারানোর ভয় নেই। তাছাড়া কাছেই আরও দুই মাউন্টেন পোস্ট আছে নিজেদের, তাদের সাথেও যোগাযোগ করেনি ওরা, তাহলে?

উঠে পড়ল সে, কাগজগুলো পকেটে রেখে সিগারেট ধরাল। হাটের সর্বত্র নেচে বেড়াচ্ছে অন্যমনস্ক নজর। এই এলাকা বিপজ্জনক, বিপদ যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে। টহল দিতে গিয়ে ভেঙে পড়া তুষার ব্রিজের নিচে চাপা পড়া, অথবা ফাটলে আছড়ে পড়ে মরা, কোনটাই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাই বলে চারজন একসঙ্গে?

হাটের ফ্লোর, বাঙ্ক, স্টোভ, ফুড কাবার্ড, সবকিছুর ওপর নেচে বেড়াচ্ছে তার। হঠাৎ কয়েক পা এগিয়ে কাবার্ডের পাল্লা খুলে নজর বোলাল। নাহ্, কোথাও কোন অসমাঞ্জস্য চোখে পড়ছে না। এলোমেলো হয়ে নেই কিছু, সব ঠিক আছে মনে হচ্ছে। কিছুই

খোয়া যায়নি। ওপরের এক ডকেটে আর্মি সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের কিছু কপি দেখে তুলে নিল লেফটেন্যান্ট, পড়ল। ওপরের কপিটা দেখা গেল গতকালকের। কন্টারে করে এদের জন্যে দু'সপ্তাহের রেশন পাঠানো হয়েছে, তার চালান। ক্যানড মাংস, মাছ, ফল, কফি, সিগারেট ইত্যাদির।

কি ভেবে চালানের সাথে ভেতরের মজুত মিলিয়ে দেখতে শুরু করল অফিসার। মিলল না, বেশ কিছু ক্যান নেই। অথচ চারজনের পক্ষে এতসব একদিন কেন, তিনদিনেও শেষ করা সম্ভব নয়। তাহলে? দেখতে দেখতে চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তার। এর অর্থ কি? ভাবল সে।

হঠাৎ বাইরে থেকে একটা হাঁক ভেসে আসতে চমকে উঠল, দ্রুত বেরিয়ে এল হাট থেকে। 'কি হয়েছে?'

হাত তুলে একটা জায়গা নির্দেশ করল সৈনিকদের একজন; এই লোকই হাঁক ছেড়েছিল। সেদিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট, জমে গেল। একটা স্নো-ব্যাঙ্ক দেখাচ্ছে লোকটা, আলগা কিছু তুষার আপনাআপনি ঝরে পড়েছে ওখান থেকে। একটা স্কির মাথা উঁকি দিচ্ছে ওর মধ্যে থেকে।

দশ মিনিট পর, পাশাপাশি শোয়ানো চার গার্ডের মৃতদেহগুলোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে অফিসার। এমন কাণ্ড কি করে ঘটল, কারা ঘটাল, কিছুই মাথায় আসছে না। রাগে একটু একটু কাঁপতে শুরু করল সে। সিরিয়ান সৈন্যরা মাঝেমধ্যে ঝামেলা করে, ইনফিলট্রেট করে, জানা আছে তার, কিন্তু এই ওয়েদারে? অসম্ভব! তুলযুক গ্লেসিয়ার···অসম্ভব! মরে গেলেও বিশ্বাস করবে না সে।

বছরের এই সময় তুলযুকের আইসফল হয়ে ইসরাইলে ঢোকার কথা খোদ শয়তানও চিন্তা করবে না। তাহলে বাকি থাকে

আশেপাশের কিছু গ্রামের আরব অধিবাসী। সিরিয়ান গ্রাম, অবশ্য নামেই। তুলযুকের কারণে বছরে নয় মাসই মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে ওগুলো। সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ওরাই কি···? এতবড় দুঃসাহসের কাজ ওরা ঘটাবে বলে মনে হলো না লেফটেন্যান্টের।

যদি জানাজানি হয়ে যায়, ফল কি হবে ভালই বোঝে ব্যাটারা। তাহলে? আরও কিছুক্ষণ মাথা খাটাল সে, কোন সম্ভাবনাই মনে ধরল না। কাজেই হাটে ফিরে ডিটেইলড্ রিপোর্ট করল সে বেজে।

বেশ কিছু সময় পর জবাব এল: সীক অ্যান্ড পানিশ।

তৃপ্তির হাসি ফুটল তার মুখে। নির্দেশটা পছন্দ হয়েছে, ভারি মনে ধরেছে তার। ধরারই কথা, কেন না ওই কাজ খুব ভাল পারে লেফটেন্যান্ট। চারটে কেরোসিনের ছোট ড্রাম খুঁজে বের করল তার টীম, ওগুলো নিয়ে বের হয়ে পড়ল, অল্প সময়ের মধ্যে। মনে মনে আওড়াল, সীক অ্যান্ড পানিশ। চমৎকার। অনেকদিন পর মনের মত একটা কাজ পাওয়া গেল তাহলে।

প্রায় পাঁচ মাইল এগোল সে দল নিয়ে, তারপর থামল। সন্দেহের চোখে তাকাল চারদিকে। এতদূর আসার পরও কোন ট্রেইল চোখে পড়েনি, অথচ পড়ার কথা ছিল। এরমধ্যে নতুন করে তুষার পড়েনি, পড়লে ধরে নেয়া যেত চাপা পড়ে গেছে। ট্রেইল থাকা উচিত ছিল, প্রিন্ট থাকা উচিত ছিল। বর্বর আরবরা যে সীমান্ত অতিক্রম করেছে, তার কোন না কোন চিহ্ন অবশ্যই থাকা উচিত ছিল, অথচ কিছুই নেই।

ঘুরল সার্চ পার্টি, অনেকখানি জায়গা নিয়ে নতুন করে অনুসন্ধান শুরু করল গোটা উপত্যকা জুড়ে। না, নেই কোন চিহ্ন। অবশেষে পাঁচ ঘণ্টা পর হাল ছেড়ে দিল লেফটেন্যান্ট, ফিরে চলল পিল বক্সে। সূর্য তখন ডুব দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। রেগে কাঁই হয়ে আছে অফিসার, প্রায় অকারণেই দুই সৈনিককে কষে চড়-চাপড়

লাগাল। কিছু না, নির্দেশ মানতে ক্লান্তির কারণে দুই-এক সেকেন্ড দেরি করে ফেলেছে ওরা, তাই।

ব্যারাক হাটে ফিরে স্টোভ জ্বালাতে নির্দেশ দিল সে, রাত কাটাবার প্রস্তুতি নেয়ারও। রান্না চড়ানোর আয়োজন চলছে দেখে আবার বেরিয়ে এসে পিলবক্সের শেষমাথার দিকে এগোল। হাতে সিগারেট জ্বলছে, কুঁচকে আছে কপাল। অনুসন্ধানী চোখে তুষার পরীক্ষা করছে। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল অথচ শত্রুর আসা-যাওয়ার কোন চিহ্নই নেই, ব্যাপারটা কোনমতেই মেনে নিতে পারছে না।

আরব মেষপালকরা এত ধূর্ত কবে থেকে হলো? ভ্যালি ওয়াল ঘেঁষে একশো মিটারমত এগোল সে, উল্টো দিকে। ওয়ালের এক জায়গা ভাঙা দেখে ব্রেক কষল। বুটের গভীর ছাপ! ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া দেয়ালের সাথে উঠে গেছে। পায়ে পায়ে দেয়ালের মাথায় চলে এল লেফটেন্যান্ট, দাঁড়াল। ওপাশে আরও কিছু ছাপ দেখল, তারপর হাওয়া। ছাপ কোনদিক গেছে বোঝার উপায় নেই, মিলিয়ে গেছে আচমকা।

আঁধার ঘনিয়ে আসছে, তাই ভাল করে দেখার জন্যে হাঁটুতে ভর রেখে ঝুঁকল অফিসার। ঝাড়া দু'মিনিট চোখ কুঁচকে সারফেস পরখ করল, তারপর সিধে হলো চট্ করে। বুঝে ফেলেছে ব্যাপার। শত্রু যে সাধারণ মেষপালক নয়, বুঝে গেছে। ছাপ কেন নেই, তাও দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। নজর তুলে উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে তাকাল, বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোর অবস্থানের দিকে।

শত্রু যারাই হোক, ওদিকেই কোথাও গেছে। তাই তো বলি। আপনমনে মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল চট্ করে। কাল দিনের আলো ফুটলে যা করার করতে হবে, আজ নয়।

গোটা উপত্যকা জুড়ে উল্টোপাল্টা ছোটাছুটি করছে মাসুদ রানা, কোথাও কোথাও থেমে চক্কর মারছে, তারপর ফের ছুট্। অন্যরা অন্ধের মত অনুসরণ করছে ওকে।

সবাই বোঝে শত্রুর সম্ভাব্য ধাওয়ার হাত থেকে বাঁচার ক্ষেত্র তৈরি করছে ও, প্রিন্টের গোলকধাঁধা সৃষ্টি করছে তুষারের বুকে। আবহাওয়া ভাল এখন, নতুন করে তুষারপাতের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। অতএব ব্যাপারটা সার্চ পার্টির চোখে যাতে পড়ে, সেই ব্যবস্থা করছে।

কাজ সেরে থেমে পড়ল ও, পিছনে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট হয়ে। চলবে। যে নকশিকাঁথা তৈরি করেছে ওরা, তা দেখে ওদের গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে যথেষ্ট সময় লাগবে সার্চ পার্টির।

এরপর ছাপ মোছার কাজে হাত লাগাল ওরা নতুন করে। সবচেয়ে কঠিন, প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, তবু হাল ছাড়ল না রানা। লাইনের পিছনে থেকে নিজ হাতে তুষার সমান করতে করতে ফিরে চলল ক্যাম্পের দিকে। অবশ্য যথাসম্ভব শক্ত বরফের ওপর দিয়ে এগোল। সন্ধের একটু আগে ক্যাম্পে পৌঁছল দল। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর খিদে-তেষ্টায় প্রত্যেকের বেহাল অবস্থা তখন।

খেয়েদেয়ে ক্যাম্প গোটানোর নির্দেশ দিল রানা, কাজ সারা হতে তারার নির্দেশ অনুযায়ী দক্ষিণে, জায়ন লেকের উদ্দেশে যাত্রা করল। বেশ অনেকটা ঘুরপথে এগোল ও, পথে তিলাতের মাইলখানেক দূরে আতাসীকে দলের নেতৃত্বে রেখে ক্যাপ্টেন আব্বাসকে নিয়ে খুঁজে বের করল গ্রাম। হেডম্যান নাসিফকে খুঁজে বের করে ফিরতি পথের সাপ্লাই ইত্যাদি নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল।

রওনা হলো আবার। এই পর্যায়ে ছাপ মোছার কথা ভাবল না রানা। কারণ, সেটা অসম্ভব। রাতের বেলা কাজটা নিখুঁত হবে না। তাছাড়া ওর ভরসা আছে, পিছনে যা করে রেখে এসেছে, শত্রুকে বেদিশা করতে তাই যথেষ্ট।

ভোর হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে জায়ন লেকের এক মাইল দূরের ছোট এক পাহাড়ে আশ্রয় নিল মিশন ডুমসডে।

আট

পরদিন সূর্য ওঠার এক ঘণ্টা আগে আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল রানা, আতাসী, আব্বাস, মসউদ ও মাহের। সঙ্গে থাকল নাইলনের ফিতের জালে বাঁধা দুই অয়েস্টার, প্যাকফ্রেম, নাইলন লাইন, পিটন ও স্ন্যাপ লিঙ্ক, হাতুড়ি, রাইফেল ও গুলি, আর কিছু খাবার ও অরেঞ্জ জুস।

সার্জেন্ট জুবায়ের বাকি সব পাহারা দেয়ার জন্যে ক্যাম্পে রয়ে গেল। দুপুরে বেজ কোন সিগন্যাল পাঠায় কি না, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে তাকে।

ওদিকে সাদিক মাহেরের সঙ্গে রানার সম্পর্ক কিছুটা উন্নত হয়েছে, একতরফা যদিও। প্রয়োজন দেখলে তার সঙ্গে কথা বলছে রানা, এটা-ওটা নির্দেশ দিচ্ছে, মাহেরও তা পালনে দেরি করছে না। তবে কথা বলছে না সে কারও সঙ্গে, রানার চোখে চোখে তাকাচ্ছে না। বুঝতে অসুবিধে হয় না আগের দিনের অপমানের

কথা ভুলতে পারছে না ও। যদিও ওর প্রতি রানার আচরণ প্রায় স্বাভাবিক।

ব্যাপারটাও নিজেও ভুলে থাকতে চায়। তা ছাড়া উপায়ও নেই। কেন না মিশনের সদস্য সংখ্যা সীমিত, ভাগ ভাগ করা আছে সবার কাজ, একজনকে বসিয়ে রাখলে চলবে না। যা ঘটে গেছে, তা ফেরানোর পথ নেই, মেনে নেয়া ছাড়া উপায়ও নেই। না নিলে সমস্যা বরং আরও বাড়বে। কাজেই অতীত নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না রানা। অন্তত এখনই নয়।

দলটা যখন জায়ন লেকের তীরে পৌঁছল, সূর্যের আলো তখনও তার কাঁচের মত স্বচ্ছ পানি ছুঁতে পারেনি। কুয়াশা বাধা দিচ্ছে।

একই সময়ে গার্ড পোস্ট থেকে বেরিয়ে এল লেফটেন্যান্ট ও তার বাহিনী। স্নো ভ্যালির দেয়াল ধরে এগিয়ে মাথায় চলে এল। রাতে তুষার পড়েনি, কাজেই ছাপগুলো একদম স্পষ্ট ফুটে আছে। বাতাসে ওপরের কিনারা ভেঙে গেছে বটে, কিন্তু তাতে কিছু আসবে যাবে না।

লম্বা যাত্রার জন্যে সৈন্যদের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিল লেফটেন্যান্ট।

ডুমসডের সদস্যরা যখন মেইরনের গা বেয়ে চড়তে শুরু করল, আস্তে আস্তে কেটে যেতে আরম্ভ করল কুয়াশা। ড্যামের আলো দেখতে পেল রানা। লেকের পানি একদম স্থির। চারদিকের লম্বা লম্বা ঘাস, নলখাগড়া ইত্যাদি আকাশে বর্শার মত মাথা তুলে আছে।

পাহাড়ে চড়ার সময় দলের নেতৃত্ব দেবে ক্যাপ্টেন আব্বাস। রানা ও আতাসীর কোমরে বাঁধা লাইন থাকবে তার হাতে। রানা

ও আতাসী প্যাকফ্রেমে দুই অয়েস্টার নিয়ে তার পিছনে থাকবে। মাহের ও মসউদ থাকবে সবার পিছনে, ভার বহনে সমস্যায় পড়লে রানা-আতাসীকে সাহায্য করবে।

রানার ইঙ্গিত পেয়ে উঠতে শুরু করল আব্বাস। খুব সতর্কতার সাথে, ধীরে ধীরে। পা রাখার নিরাপদ, নিরেট জায়গা বাছাই করে, থেমে থেমে প্রথম পঞ্চাশ ফুট উঠে গেল সে। গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল বাকি সবাই। এখান থেকে ওটার মুখ দেখা যায় না, কেবল ভেজা, কালো পাথরের গা দেখা যায়।

বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল আব্বাস, আবার উঠতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করল মাসুদ রানা, আতাসী থাকল পাঁচ গজ পিছনে। বোমা ভরা থলির দুই হাতল ওদের দুই কাঁধে, ওগুলো যাতে স্থানচ্যুত হতে না পারে সে জন্যে বুক ও পিঠের কাছে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা। বোমা পিঠের ওপর ঝুলছে। কয়েক পা উঠে ওপরে তাকাল রানা, কয়েকটা ঈগলের আবছা কাঠামো দেখতে পেল। কুয়াশার হালকা পর্দার ভেতর দিয়ে চিলের মত নিচের দিকে নামছে, আবার পাক্ খেয়ে উঠে যাচ্ছে।

দুই ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর জায়গাটা চোখে পড়ল সার্চ পার্টির। দৌড় থামিয়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে নকশা পরীক্ষা করতে লাগল লেফটেন্যান্ট। বুঝল অনেকখানি জায়গা নিয়ে অনর্থক ছোটাছুটি করেছে শত্রু। না, অনর্থক নয়, তাদের হয়রান করার উদ্দেশ্যে। বড়সড় এক জায়গায় অসংখ্য স্কির ছাপ, তার চারদিকে কিছু নেই। একদম মসৃণ সারফেস।

হুঁম! ভাবল অফিসার, দলটার নেতা যে-ই হোক, বুদ্ধি আছে ব্যাটার। অনেক চেষ্টার পরও যখন শত্রুর গমনপথের খোঁজ পাওয়া গেল না, হতাশ হয়ে পড়ল সে। হাল প্রায় ছেড়েই দিচ্ছিল, এমন

সময় জিনিসটা চোখে পড়ল।

অনেক দূরে, কী যেন একটা পড়ে আছে, চিক্‌চিক্ করছে সূর্যের আলোয়। ছুটল সে, প্রায় আধমাইল দৌড়ে দেখা পেল জিনিসটার। কাঁচের বোতল। তুলে নিল লেফটেন্যান্ট। সঙ্গে সঙ্গে কপাল কুঁচকে উঠল তার। স্কচের বোতল ওটা, জনি ওয়াকারের। কঠোর ট্রেনিং পাওয়া মন সতর্ক করল তাকে।

ওরা আর যা-ই হোক, ভাবল অফিসার, অন্তত স্থানীয় মেষপালক নয়। মেষপালকরা এই জিনিস চোখেও দেখে না। মুখ তুলে চারদিকে তাকাল। তাহলে, কারা ওরা? সিরিয়ান সৈন্য? কেন ওরা এদিকে আসবে? কি আছে এদিকে? কিছুই তো নেই, তাহলে? কেন খুন করল ওরা তাদের চার গার্ডকে?

বোতলটা নিজের ব্যাকপ্যাকে ভরে নতুন করে প্রিন্ট খোঁজায় মন দিল সে। পেয়েও গেল অল্পক্ষণের মধ্যে।

মেইরনকে ঘিরে কুয়াশার হালকা যে পর্দাটা ছিল, মিলিয়ে গেছে তা। এক হাজার ফুট উচ্চতা অতিক্রম করে এসেছে ওরা। অয়েস্টারের ওজন অসহ্য হয়ে উঠেছে, দরদর করে ঘামছে রানা ও আতাসী। পিছনটানের কারণে কোমর বেঁকে যাওয়ার অবস্থা, পায়ের অবস্থা আরও খারাপ।

ওপর থেকে ক্ষীণ ধারায় বরফগলা পানি পড়ছে। ব্যাপারটাকে আশীর্বাদ মনে হচ্ছে রানার, সুযোগ পেলেই ধারার নিচে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছে ও। ঠাণ্ডা পানিতে মাথা-মুখ ভিজিয়ে নিচ্ছে। আতাসীও তাই করছে।

ঘড়ি দেখল রানা, এগারোটা দশ। অনেক নিচে বড়, আয়তাকার নীল এক রুমালের মত বিছিয়ে আছে জায়ন লেক। বাঁধের ওপাশের গিরিখাতের ওপর হালকা কুয়াশা ভাসছে। ওপরে

তাকাল ও, দড়ি নিয়ে উঠে যাচ্ছে আব্বাস। লম্বা করে দম নিয়ে ও-ও পা বাড়াল।

ঠিক একটায় মেইরনের মুখের কাছে পৌঁছল ওরা। আব্বাস পৌঁছে গেছে নিচের ঠোঁটের স্ল্যাবের ওপর, পৌঁছেই লাইন বেঁধে ফেলল সে মজবুত করে। বুঝতে পেরেছে রানার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। পড়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। ও পড়লে টান খেয়ে আতাসীও পড়ে যাবে।

আব্বাসের বাড়ানো হাত ধরে অনেক ধস্তাধস্তি করে স্ল্যাবে উঠে পড়ল রানা। বেশ চওড়া ওটা, দু'তিনজন অনায়াসে হাত-পা ছড়িয়ে শুতে পারবে। দু'পা, এগিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল ও। আতাসীও উঠল কয়েক মিনিট পর। মাহের ও মসউদ পৌঁছতে ভারমুক্ত করা হলো ওদের দু'জনকে।

প্রায় পনেরো মিনিট জিরিয়ে নিয়ে উঠল ওরা, আসল কাজ শেষ করতে লেগে পড়ল। পাথরের সাথে পিটন ঠোকার ঠং-ঠং আওয়াজ উঠতে লাগল, জায়গামত অয়েস্টার আটকাবার আয়োজন চলছে। স্ল্যাবের কিনারার কাছে গিয়ে উঁকি দিল রানা। চিক্‌চিক্ করছে জায়ন লেক। এত ওপর থেকে বাঁধের দেয়ালটাকে প্লাইউডের মত ভঙ্গুর মনে হচ্ছে। অনেক দূরে জেটিতে ছোট্ট একটা বোট দেখল রানা। টহল বোট।

মাথাটা ভাঙলে কোথায় পড়বে দেখল ও, তারপর কি ঘটবে তাও বুঝল। শিউরে উঠল মনে মনে। আধঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ করে সব ঠিক আছে কি না চেক করে নিল রানা, তারপর দ্রুত দুপুরের খাওয়া সেরে নামার প্রস্তুতি নিল। শুরুতেই নিজের পা দুটো নিয়ে সমস্যায় পড়ল ও। নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না।

ষাট পাউন্ড ওজনের অয়েস্টারে অভ্যস্ত পা দীর্ঘ সময় পর ভারমুক্ত হয়ে সমস্যার সৃষ্টি করছে, ওর দেহের হালকা ওজনের

সাথে সমন্বয় বজায় রাখতে পারছে না। দুশো ফুট নামতে দু'বার আছড়ে পড়ল রানা, পিছলে নেমে গেল অনেকটা। তবে কোমরে লাইন বাঁধা থাকায় বড় কোন সমস্যায় পড়তে হলো না। ওপর থেকে ক্যাপ্টেন আব্বাস নিয়ন্ত্রণ করছে দড়ি।

একটু বিশ্রাম নিয়ে এগোলে সুবিধে হবে ভেবে আবার দশ মিনিট বসল রানা। তারপর পা বাড়াল। এবার আতাসী থাকল ওর আগে। আড়াই হাজার ফুটে নেমে প্রায় মসৃণ, বিপজ্জনক খাড়া পাথরের স্তরে পৌঁছল, অনেকখানি নেমে একটা বেরিয়ে থাকা শেলফে গিয়ে ঠেকেছে অংশটা। আতাসীকে ওখানে পা রাখার জায়গা খুঁজতে দেখে ওপর থেকে সতর্ক করল রানা।

ওর লাইন পছন্দসই এক স্পারে পেঁচিয়ে দিল। 'হ্যাঁ, হয়েছে,' বলল রানা। 'আস্তে আস্তে নামো।'

নামতে শুরু করল বেদুইন, নিচের বাঁধ তার আড়ালে পড়ে ল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। একটু পরই ওটাকে আবার দেখতে পেল রানা। মনে হলো ড্যামের গার্ড টাওয়ারে একটা নড়াচড়া দেখেছে ও পলকের জন্যে। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না। দুশ্চিন্তা গ্রাস করল। কারা ওখানে? ভাবল রানা, গার্ড, না এঞ্জিনিয়ারদের কেউ? যদি দূরবীন দিয়ে ওপরদিকে তাকায়…তাকাবে? যদি তাকায়, তাহলে…ঘামতে শুরু করল ও।

একটু পর নিচে তাকাতে দেখল শেলফের খুব কাছে পৌঁছে গেছে আতাসী। স্পার থেকে দড়ি খুলে দিল ও, নিজে নামতে শুরু করল। ধরার মত উপযুক্ত জায়গা খুব কম আছে এখানটায়। অগভীর কিছু ফাটল, কোনমতে বুটের ডগায় অথবা আঙুলের মাথায় ভর করে দাঁড়ানো যায়। ওগুলোর সাহায্যে দানবীয় এক গিরগিটির মত একটু একটু করে নামছে রানা, গাল সেঁটে আছে উত্তপ্ত পাথরের গায়ের সাথে।

নিচে তাকাল ও, দেখল আতাসী নেমে পড়েছে শেলফের ওপর, মুখ তুলে ওর অবতরণ দেখছে। অস্বস্তি লেগে উঠল রানার। মনে হলো লেকের চেহারা আগের মত নেই, কোথায় যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিন্তু সেটা যে কি, ধরতে পারল না। থেমে ভাল করে লেকের এ-মাথা ও-মাথা নজর বোলাল একবার, হতাশ হলো—নাহ্, চোখে পড়ছে না কিছু।

আবার নামার প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু জমে গেল শেষ মুহূর্তে। নিচে তাকাল, এবং পলকে বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। বোট নেই জেটিতে, অথচ একটু আগেও ছিল। আবার ঘামতে শুরু করল রানা, হাত-পা অসাড় হয়ে এল। কোথায় গেল বোট? একটু আগেই না ওটাকে জেটিতে দেখা গিয়েছিল? টহলে বেরিয়েছে? সর্বনাশ! কি হবে যদি···!

'কি হলো, বস্?' মুখের সামনে দু'হাত জড়ো করে হাঁকল আতাসী। 'নামছ না কেন?'

খেয়াল করল না ও। এক খণ্ড মেঘ উড়ে গেল সূর্যের ওপর দিয়ে, লেকের ওপর দিয়ে ছুটে গেল তার ছায়া। আর কোন নড়াচড়া নেই, দেখা নেই বোটের। উদ্বেগ বাড়তে লাগল রানার। একেবারে খোলা জায়গায় ওরা, মাথার ওপর ঝকঝকে সূর্যের আলো, নিচ থেকে কেউ তাকালে পরিষ্কার দেখতে পাবে ওদের। জলদি নামতে হবে, ভাবল ও। চেঁচিয়ে বলল, 'আতাসী! অপেক্ষা করো, আমি আসছি। অ্যাবসেইল করে নামতে হবে।'

মাথা দোলাল বেদুইন। পিটন আর হ্যামার নিয়ে তক্ষুণি কাজে লেগে পড়ল। শেলফের আড়াআড়ি এক ফাটলে দুটো পিটন গাঁথল, হ্যামারের প্রতিটা আঘাতের শব্দ বিকট প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়ে লেগে। এরপর নিজের দড়ির কয়েল মাঝখান বরাবর ভাঁজ করে পিটনের অ্যাঙ্করেজের সাথে জুড়ে দিয়ে রানার জন্যে অপেক্ষা

করতে লাগল। ওদিকে ওপর থেকে সাদিক মাহের নামতে শুরু করেছে।

অ্যাবসেইল করে অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচশো ফুট নামল রানা ও আতাসী। আরেক শেলফে দাঁড়াল, মেইরনের মুখোমুখি তোলা স্টিলে ওটাকে থুতনি বলে আখ্যা দিয়েছিল কর্নেল হাজি। থুতনির নিচে পাহাড়ের গা খানিকটা ফুলে বেরিয়ে থাকায় লেকের কিছু অংশ দেখা যায় না। ওপারের অংশ খানিকটা দেখা যায়।

মাহের এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। কান পেতে বোটের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করল রানা—নেই।

'আমাদের তাড়াতাড়ি করা উচিত, বস্,' আতাসী বলল।

মাথা দোলাল রানা। 'তুমি আগে।'

দড়ির দুই প্রান্ত বাঁ হাতে ধরে লেকের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল লেফটেন্যান্ট, ডান উরুর তলা দিয়ে ওগুলো সামনে নিয়ে এসে বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে ছেড়ে দিল, তারপর বাঁ হাতের তলায় ডান হাত ভরে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল ঝুলন্ত প্রান্ত। মুঠো আলগা করে প্রয়োজনমত দড়ি ছাড়বে এখন ও, অবরোহনের গতি নিয়ন্ত্রণে রেখে অনায়াসে এবং নিরাপদে নেমে যেতে পারবে।

প্রস্তুতি সেরে একটু বিরতি দিল বেদুইন, ঘাড় ঘুরিয়ে লেকের ওপর নজর বুলিয়ে কান পাতল। এখনও সাড়া নেই বোটের। 'চললাম।'

মুখ বাড়িয়ে তার নেমে যাওয়া দেখল রানা। একেকবারে পঁচিশ-ত্রিশ ফুট করে নামছে বেদুইন। পাহাড়ের গায়ে জোড়া পায়ের লাথি মেরে দূরে সরে সরসর করে নেমে যাচ্ছে, দোল শেষ হতে ফিরে এসে আবার লাথি মারছে, স্প্রিঙের পুতুলের মত। দেড়শো ফুট নিচে পাথরের আরেক তাকে থামল ও, ছেড়ে দিল দড়ি।

মাহেরের দিকে ফিরল রানা। 'এব্যার তুমি।'

নীরবে নেমে গেল ক্যাপ্টেন। এরপর রানার পালা। মাত্র তিনবার দীর্ঘ অ্যাবসেইল করে তাকে পৌঁছে গেল ও। লেকের দু'হাজার ফুট ওপরের তাকটা সরু, দড়ি যে জায়গা দিয়ে নেমে গেছে, সেখানটা ভাঙা। তার দু'দিকে দু'পা রেখে দড়ি শক্ত মুঠোয় ধরে জিরিয়ে নেয়ার জন্যে দাঁড়াল ও। ওর বাঁয়ে নতুন করে পিটন গাঁথার প্রস্তুতি নিচ্ছে আতাসী, মাহের ডানে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। ও যেখানে আছে, তাক সেখানে বেশ সরু, এবং ঢালু। ওদিকে ওপরে আব্বাস রানার দড়ি ছাড়ার অপেক্ষায় আছে, তার পালা এবার।

ওই অবস্থায়ই আবার নিচে তাকাল রানা। দড়ির গিঁট বাঁধা প্রান্ত তাকের বিশ ফুট নিচে ঝুলছে, বাতাসে দোল খাচ্ছে ফিতের মত। আর কোন নড়াচড়া নেই। পিটনে হ্যামারের বাড়ি মারল আতাসী, পাথুরে দেয়ালে লেগে প্রায় পিস্তল ফোটার আওয়াজ তুলল ওটা। প্রায় একই মুহূর্তে অন্য একটা শব্দ শুনল রানা। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিল, 'থামো! কিসের আওয়াজ···!'

হাতুড়ি রেখে কান পাতল বেদুইন। শোনা গেল আওয়াজটা, মৌমাছির দূরাগত গুঞ্জনের মত। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে খসখসে হয়ে উঠল রানার। 'বোট!' বিড়বিড় করে বলল, 'বোট আসছে।'

কথাটা পুরো শেষ করতে পারেনি ও, আচমকা ডান পায়ের অবলম্বন খসে পড়ল। ভাঙা অংশের কিনারা ব্যর্থ হয়েছে ওর ভার ধরে রাখতে। সড়াৎ করে পা-টা পিছলে যেতেই আত্মা উড়ে গেল রানার, নাড়িভুঁড়ি একলাফে উঠে এল টাক্‌রা পর্যন্ত। দড়ি ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করল ও, হলো না। চোখের পলকে কিনারা গলে নেমে গেল। তার আগে আতঙ্কিত গলায় দুটো মাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে পারল ও, 'আতাসী! ধরো···!'

পড়ে যাচ্ছে মাসুদ রানা, হাতের তালু পুড়িয়ে সরসর করে বেরিয়ে যাচ্ছে লাইন, মগজে যেন আগুন ধরে গেছে, তবু মুঠো ছাড়ল না রানা। তালুর মায়া ছেড়ে সর্বশক্তিতে চেপে ধরে রাখল। একটু পর দড়ির গিঁটের ওপর পৌঁছে ভয়ঙ্কর ঝাঁকিটা খেল ও, থেমে গেল পতন। মেরুদণ্ড বেয়ে তীব্র ব্যথার ঢেউ উঠছে একের পর এক। চোখ ভরে গেছে পানিতে।

দড়ি ধরে বসে আছে রানা, চোখ বন্ধ। অসহ্য যন্ত্রণার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, পাক্ খাচ্ছে।

গোটা ব্যাপারটা এত অচিন্তনীয়, এত অকল্পনীয় ছিল যে হায় হায় করা ছাড়া আর কিছু করার উপায় ছিল না আতাসীর। করলও তাই। পরক্ষণে জোর এক ঝাঁকি খেয়ে দড়ি টান্ টান্ হয়ে উঠেছে দেখে সচকিত হলো, উঁকি দিল নিচে। দড়ির মাথায় রানাকে ঝুলতে, পাক্ খেতে দেখে আশায় নেচে উঠল মন।

'মেজর!' ডেকে উঠল ও। 'মেজর! বস্!'

সাড়া নেই। আবার ডাকল আতাসী, গলা চড়িয়ে। নড়ে উঠল রানা, ধীরে ধীরে মুখ তুলে ওপরে তাকাল। নীল রুমালের জমিনে ওর সাদা, ঘামে ভেজা মুখটা চক্ চক্ করে উঠল।

'সাহায্য করো!' মাহেরের উদ্দেশে প্রায় গুঙিয়ে উঠল ও। 'মেজরকে তুলতে সাহায্য করো আমাকে।'

'নিশ্চই!' বিচ্ছিরি শব্দে হেসে উঠল সাদিক মাহের। 'সাহায্য না করলে বোটের চোখে পড়ে যেতে পারে লোকটা। তাহলে বিপদে পড়তে হবে আমাদের।'

তাকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে দড়ি ধরার চেষ্টা করতে লাগল আতাসী, মন সেদিকে ব্যস্ত বলে লোকটার বলার মধ্যে যে বিদ্রূপ আর ঘৃণা ছিল, ধরতে পারল না। তার দেরি দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে তাকাল ও। খেঁকিয়ে উঠল, 'বলছি না সাহায্য...'

ব্রেক কষল বেদুইন, ঘটনা দেখে আস্তে আস্তে ঝুলে পড়ল চোয়াল। ডানহাতে ওর বুক সই করে আর্মালাইট ধরে রেখেছে মাহের, বাঁ হাতে খুর। দড়ির ফুটখানেক দূরে আছে ওটা, এগোচ্ছে।

'কি করছ তুমি?' আঁতকে উঠল আতাসী।

হিংস্র হাসি ফুটল ক্যাপ্টেনের মুখে। 'এই মুহূর্তে জান বাঁচাতে হলে যা করতে হবে তাই করছি। মেজরকে ফেলে দিচ্ছি নিচে, নইলে বোট থেকে দেখে ফেলবে ওরা। আমরা সবাই মরব। না, খবরদার!' ধমকে উঠল সে। 'প্রাণের দরদ থাকলে নোড়ো না, লেফটেন্যান্ট। আমি কিন্তু গুলি করব।'

লোকটার চোখে খুনের নেশা দেখে জায়গায় জমে গেল আতাসী, অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকল।

খুর দড়ির সাথে ঠেকাল মাহের, পোচ দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটল ব্যাপারটা। জ্বলজ্বলে সূর্যের ভেতর থেকে একেবারে আচমকা বেরিয়ে এল একটা চাফ, মাহেরের মুখের সামনে ওটার গাঢ় ছায়া পড়তে পলকের জন্যে চমকে উঠল সে। শিউরে উঠল। মিসাইলের মত ছুটে এল ঈগল সাইজের বড়সড় কাকটা, ঝাঁপিয়ে পড়ল মাহেরের ঘাড়ের ওপর।

তার মাথায় ওটার ঠোকর ও ঘাড়ের চামড়ায় আঁচড়ের বিশ্রী শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল আতাসী। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল যুবক, ঘাড় গুঁজে ওটার পরেরবারের আক্রমণ থেকে বাঁচার ব্যর্থ চেষ্টা করল। ওটার লাল পায়ের লম্বা লম্বা নখের বিষাক্ত আঁচড়, ঠোকর ও শক্তিশালী ডানার বাড়ি খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ল, খুর ছেড়ে একহাতে নিজেকে বাঁচাতে ব্যর্থ চেষ্টা করল। ডানার গা ঘেঁষে ঝিলিক মেরে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

তাতেও যখন কাজ হলো না, আর্মালাইট পাহাড়ে ঠেস দিয়ে

রেখে দু'হাতে ওটাকে ঠেকানোর প্রস্তুতি নিল মাহের। কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ঠিকমত করতে পারল না কাজটা, কাত হয়ে ঠাস করে পড়ে গেল ওটা, পরমুহূর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্রুদ্ধ চাফ। কর্কশ চিৎকার দিয়ে তার মুখের একপাশে আক্রমণ চালিয়ে বসল।

পরপর তিনবার ওটার বিষাক্ত আঁচড় খেয়ে যন্ত্রণায় বেদিশা হয়ে পড়ল মাহের, কোথায় আছে সে কথা ভুলে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্যে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে গেল, অমনি ঢালু তাকে হড়কে গেল এক পা। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তীব্র আতঙ্কে চেহারা ভীষণরকম বিকৃত হয়ে উঠল তার। তৎক্ষণাৎ অন্য পা-টা ভাঁজ করে বসে পড়ার চেষ্টা করল, বসে পড়েওছিল। কিন্তু খুব দ্রুত কাজ সারতে গিয়ে এবারও শেষ রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো। ডান কাঁধ বেশ জোরে ধাক্কা খেল পাহাড়ে, ভারসাম্য পুরোপুরি হারিয়ে দেহ ঝুঁকে পড়ল বাইরের দিকে। দু'হাতে মরিয়া হয়ে পাথর খাবলে ধরার চেষ্টা করল সে, হলো না।

তার বুকফাটা প্রলম্বিত চিৎকারে শিউরে উঠল আতাসী। ঠিকমত কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই ক্যাপ্টেনকে শূন্যে ভেসে পড়তে দেখল। শেষ মুহূর্তে চোখাচোখি হলো দু'জনের। মাহেরের চোখে তীব্র আতঙ্ক আর আকুতি দেখতে পেল ও, পরমুহূর্তে দেহটা চোখের আড়ালে চলে গেল। তার টানা চিৎকার বাতাসে ভেসে বেড়াল কিছুক্ষণ, মেইরনের গায়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল, তারপর মিলিয়ে গেল।

আতাসীর মনের পর্দায় বিভীষিকাময় দৃশ্যটা চিরকালের জন্যে স্থায়ী ছবি হয়ে রইল।

ওদিকে এঞ্জিনের গুঞ্জন বেশ কাছে এসে পড়েছে মনে হলো ওর। যদি এপার ঘেঁষে যায় বোট, তাহলে কি ঘটবে ভেবে শিউরে

উঠল। 'মেজর, তুমি ঠিক আছ?' চেঁচিয়ে বলল ও।

নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল রানা, মুখ তুলল ধীরে ধীরে, মাথা দোলাল।

'নোড়ো না। একদম স্থির হয়ে থাকো।'

এবারও মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল ও, নিচে তাকাল। অনেক নিচে, মেইরনের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে ছাতু হয়ে যাওয়া মাহেরের দেহটা একটু একটু দেখা যায়, সেদিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ইসরাইলী টহল বোটের বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় থাকল।

ওদিকে কিচিরমিচির শব্দ শুনে মুখ তুলল আতাসী। যেখানে এতক্ষণ মাহের দাঁড়িয়েছিল, তার হাতখানেক ওপরের এক গর্ত থেকে আসছে আওয়াজটা। আক্রমণকারী চাফের বাসা। এইবার বোঝা গেল ওটার মাহেরকে আক্রমণের কারণ।

চাফটাকে দেখল ও, গর্তের দিকে ঘুরে ডানা দু'দিকে মেলে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চাদের আড়াল করে। ঘাড় ঘুরিয়ে সন্দেহের চোখে আতাসীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

একটু পর দেখা দিল বোট। সরাসরি রানার নিচ দিয়ে চলে গেল মন্থরগতিতে। আব্বাস নেমে এল, দু'জনে মিলে টেনে তুলতে শুরু করল রানাকে। মেইরনের গোড়ায় যখন পৌঁছল ওরা, সূর্য তখন পাটে বসতে চলেছে। সাদিক মাহেরের মৃতদেহ খুঁজে বের করে কোনমতে কবর দিল ওরা, তারপর ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে ক্যাম্পের পথ ধরল।

ওই একই সময় দীর্ঘ সফর সেরে ডুমসডে মিশনের আগের রাতের ক্যাম্প সাইট ঘুরে তিলাতের কাছে পৌঁছল ইসরাইলী সার্চ পার্টি। দুপুরে খাওয়ার জন্যে আধ ঘণ্টার মত থেমেছিল ওরা,

নইলে সারাটাদিন দৌড়ের ওপর দিয়েই গেছে।

উদ্বিগ্ন, ক্লান্ত লেফটেন্যান্ট আগে ছিল, কাজেই গ্রামের দিকে চলে যাওয়া রানা ও আব্বাসের স্কির ছাপ প্রথমে সে-ই দেখল। সীক অ্যান্ড পানিশ, ভাবল সে। সৈনিকদের নির্দেশ দিল ছড়িয়ে পড়তে। তাই করল ওরা। উজি বাড়িয়ে প্রায় ঘেরাও করে ফেলল খুদে গ্রাম। সন্ধে হয়ে আসছে বলে মেষপালকরা যার যার পশুর পাল নিয়ে গ্রামে ফিরছিল; ইসরাইলী সৈন্য দেখে জান উড়ে গেল তাদের, সব ফেলে গ্রামে খবর দিতে ছুটল পড়িমরি করে।

গোটা গ্রাম সার্চ করল লেফটেন্যান্ট, সন্দেহজনক কাউকে না পেয়ে নারী-পুরুষ, শিশু, সবাইকে জড় করল এক জায়গায়। গ্রামে কারা এসেছিল, তাদের পরিচয় কি, জানতে চাইল। জবাব পাওয়া গেল না। হেডম্যান নাসিফ ছাড়া রানা ও আব্বাসের উপস্থিতির কথা অন্যরা জানেই না বলতে গেলে, তাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকল প্রশ্নকারীর দিকে।

মেনে নিতে পারল না লেফটেন্যান্ট, মানতে চাইল না আসলে। তার দরকারটাই বা কি? সীক অ্যান্ড পানিশ, স্পষ্ট অর্ডার আছে তার কাছে। সীক করেছে সে, এখন পানিশ বাকি। কাজেই তাড়াতাড়ি ঝামেলা শেষ করতে লেগে পড়ল।

ধাওয়া করে গ্রামবাসীদেরকে নিজেদের ঘরে ঢোকাল ইসরাইলীরা, পশুগুলোকেও। বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে সঙ্গে আনা চার ড্রাম কেরোসিনের সদ্ব্যবহার করল, তারপর আগুন ধরিয়ে দিল ঘরে ঘরে।

অল্প সময়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তিলাত। মানুষ, ভেড়া, ভেড়ার পশম থেকে তৈরি কয়েক বস্তা উল—সব।

ক্যাম্পে ফিরে সার্জেন্ট জুবায়েরের জ্বালানো আগুনের পাশে বসে

পড়ল মাসুদ রানা। এখনও পুরো সুস্থির হতে পারেনি ও, পড়ে যাওয়ার সেই ভয়াবহ দৃশ্য থেকে থেকে মনে পড়ছে, কুঁকড়ে উঠছে ভেতরটা।

চা চড়াল সার্জেন্ট, রানার থমথমে চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। অন্যদের দেখল পালা করে। 'কোন সমস্যা হয়নি তো?'

আব্বাস মাথা দোলাল। 'না।'

'কাজ কমপ্লিট?' আবার প্রশ্ন করল জুবায়ের।

'আজকের মত।'

আগুন থেকে চোখ তুলল রানা। 'বেজের কোন মেসেজ?'

'না,' মাথা নাড়ল সার্জেন্ট। দলে মাহের নেই, এই প্রথম খেয়াল করল। 'ক্যাপ্টেন মাহের আসেননি?'

কেউ জবাব দিল না। খানিক অপেক্ষা করে প্রশ্নটা আবার করল সে। তবু সাড়া নেই।

'কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে?'

'হ্যাঁ,' মসউদ সাড়া দিল এবার।

'কি?'

'ক্যাপ্টেন···ক্যাপ্টেন বেঁচে নেই। পাহাড় থেকে পড়ে···'

আঁতকে উঠে নীরব হয়ে গেল সার্জেন্ট। তখনই শব্দটা কানে এল সবার। দূরে কোথাও কারা যেন কাঁদছে চিৎকার করে। অনেক দূরে। নারী-পুরুষ, শিশু, গলা ফাটিয়ে কাঁদছে।

'আগুন নেভাও!' নির্দেশ দিয়ে এক লাফে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। দেখল তিলাতের আকাশ লাল হয়ে আছে।

অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওরা সবাই দেখল স্তব্ধ হয়ে। এক সময় আগুন নিভে গেল, থেমে গেল দূরাগত কোলাহল। অস্থির চিত্তে ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করল রানা, তারপর অন্যদের

নিয়ে গ্রামের দিকে ছুটল। কাছের এক টিলার ওপর থেকে দেখল ইসরাইলী সার্চ পার্টির সদস্যদের। আগুন জ্বেলে দুটো নাদুস-নদুস ভেড়ার রোস্ট তৈরি করছে।

খাওয়া সেরে অনেক রাতে ফিরে গেল দলটা। টিলা থেকে নেমে গ্রামে এল ওরা, ঘুরে ঘুরে দেখল। কেউ বেঁচে নেই, প্রাণের স্পন্দন মুছে গেছে গ্রামের বুক থেকে। সৈন্যরা যেখানে পিট তৈরি করেছিল, তার কাছে কাঁচের একটা বোতল পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিল রানা।

জনি ওয়াকারের বোতল। চোখ কুঁচকে উঠল ওর, এ জিনিস এখানে এল কি করে ভেবে পেল না। মসউদ ব্যাপারটা দেখেও দেখল না। তার ধারণা একমাত্র সে-ই জানে ওটা কার কাছে ছিল, সম্ভবত। তবে এখানে কি করে এল, সে হিসেব মেলাতে পারল না যদিও।

বর্ডারের ওপারের তিন নম্বর হাটের কাবার্ডে দেখা দু'বোতল জনি ওয়াকারের ছবি রানার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু এটার সাথে ওগুলোর কোন যোগসূত্র খুঁজে পেল না। একটা প্রশ্ন মনে উঁকি দিল, কিন্তু চেপে গেল রানা।

প্রশ্ন করে লাভ নেই, জানে।

নয়

ভোর হওয়ার দুই ঘণ্টা আগে বাকি অয়েস্টার স্লেজে তোলা হলো।

ক্যাম্প গুটিয়ে অবস্থানের সমস্ত চিহ্ন যথাসম্ভব মুছে মেইরনের উদ্দেশে যাত্রা করল দল। আজ শুধু রানা ও আতাসী চড়বে, অন্যরা ওদের ফিরে আসার অপেক্ষায় কাছেই কোথাও দ্বিতীয় স্লেজ নিয়ে আত্মগোপন করে দিনটা কাটাবে।

রানার পিঠে ঝোলানো হলো অয়েস্টার ও কিছু ক্লাইম্বিং গিয়ার, আতাসী বহন করছে রেশন ও কয়েকটা সেলফ হীটিং ক্যান। এছাড়া দু'জনের সাথেই রয়েছে একটা করে নাইলন শেল্টার। ওয়েদার ফোরকাস্ট অনুযায়ী ঝড় ওঠার সম্ভাবনা আছে দুপুরের পর। যদি ওঠে, তখন দরকার হবে ওগুলো। একটা করে নাইলনের কয়েলও নিল ওরা।

এক ঘণ্টা পর রওনা হলো ডুমসডে মিশন। দূর থেকে যখন তিলাতকে পাশ কাটাল, তখনও আলো ফোটা শুরু হয়নি। বাতাসে ভেসে আসা পোড়া মাংসের গন্ধ পেল ওরা, লাল রঙের জ্বলজ্বলে চোখ দেখতে পেল জোড়ায় জোড়ায়। ভাগ্যের জোরে বেঁচে যাওয়া ভেড়া ওগুলো। সেদিকে তাকিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা।

ওর সতর্কতা কোন কাজে আসেনি, বুঝতে অসুবিধে হয় না। ওর এবং আব্বাসের স্কির ছাপ অনুসরণ করেই যে ওখানে পৌঁছেছে ইসরাইলী সার্চ পার্টি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। ওই ধরনের কিছু যাতে না ঘটে, সে জন্যে যথেষ্ট সতর্ক ছিল রানা, তারপরও ঘটল। ওর তৈরি করা ধাঁধাটা নিখুঁত ছিল বা ইসরাইলীরা ব্যাপারটা একেবারেই ধরতে পারবে না; এতটা আশা করেনি ঠিকই, কিন্তু ওরা যে এত সহজে তিলাত পৌঁছে যাবে, সে আশঙ্কাও করেনি রানা।

এসবের সঙ্গে রয়েছে আরেক গুরুত্বপূর্ণ ধাঁধা: জনি ওয়াকারের বোতলটা। ওটা কার হতে পারে, অনেক ভেবেও কোন সিদ্ধান্তে

পৌঁছতে পারছে না। গ্রামবাসীদের কারও হওয়ার প্রশ্ন আসে না, ইসরাইলীদের হওয়ার সম্ভাবনাও খুব ক্ষীণ। কেননা ওরা নিজেরাই যথেষ্ট উন্নতমানের হুইস্কি তৈরি করে, দেশী পণ্য ব্যবহার করে। তাহলে আর মাত্র একটা সম্ভাবনা বাকি থাকে: সাদিক মাহের। কিন্তু সে তো তিলাত আসেনি, তাহলে?

সে কি পথে কোথাও ফেলে দিয়েছিল বোতলটা? ইসরাইলীরা খুঁজে পেয়ে…? সেদিন ক্যাপ্টেনের ব্যাকপ্যাক কেন সার্চ করেনি, ভেবে আফসোসের অন্ত রইল না রানার। রাগে, দুঃখে মন ভার।

পুরু, শক্ত বরফের ওপর দিয়ে বেশ তাড়াতাড়ি ছুটছে স্লেজ। পুব আকাশে ঠিকমত আলো ফোটার সামান্য আগে জায়গামত পৌঁছল ওরা। জুবায়েরকে দুপুরে ট্রান্সিভার অন রাখার কথা মনে করিয়ে দিয়ে পা বাড়াল রানা। কঠিন উৎরাইয়ের জায়গাগুলোয় আগের দিন বেঁধে রাখা লাইন খোলা হয়নি, ওগুলোর সাহায্যে দুপুরের আগেই দু'হাজার ফুট উঠে পড়ল।

এরমধ্যে ঘন মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে সূর্য। কনকনে বাতাসের বেগ অনেক বেড়ে গেছে। বসে একটু জিরিয়ে নিল ওরা। অরেঞ্জ জুস খাওয়ার ফাঁকে চোখ তুলে গুরুগম্ভীর পাথুরে মুখের ওপর নজর বোলাল। ওপরের ঠোঁটের আরও ওপরে, বাঁ নাকের ফুটোয় সেট করতে হবে তৃতীয় অয়েস্টার, জায়গাটা দেখে নিল ভাল করে। ওর নিচের পাথরের গা প্রায় সমান, দাঁড়িয়ে কাজ করতে সমস্যা হবে।

'আজ ভুগতে হবে,' আপন মনে বলে উঠল আতাসী।

রানা মাথা দোলাল।

ফ্রন্টিয়ার গার্ড পোস্টের হাটে বসে আছে ইসরাইলী সার্চ পার্টির নেতা। চিন্তিত। জনি ওয়াকারের বোতলটা কোত্থেকে এল

ভাবছে। ও জিনিস তিলাতের কারও হতে পারে না, বোঝে সে। ওরা গরীব, ভেড়ার উল বেচে যা আয় হয়, তাতে কষ্টে দিন কাটায়। কাজেই ওদের কারও জনি ওয়াকার খাওয়ার প্রশ্নই আসে না। ও জিনিস নিঃসন্দেহে বাইরে থেকে এসেছে। কেউ এনেছে। কিন্তু কে? বা কারা?

হয়তো সিরিয়ান ইনফিলট্রেটর হবে ওরা। কিন্তু এমন এক গুরুত্বহীন জায়গায় কি কাজ ওদের? বছরের এই সময় কেন আসবে ওরা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে? তুলযুক গ্লেসিয়ারের খবর কি জানে না ওরা? অবশ্যই জানে। তাহলে কেন, কিসের আশায়···?

তিলাতের হতভাগ্য অধিবাসীদের জন্যে তিল পরিমাণ করুণাও জাগেনি লেফটেন্যান্টের মনে। অমন শ'খানেক বর্বর আরব পুড়িয়ে মারা কোন ব্যাপারই নয়। তবু ওদের ক্ষমা করার বিষয়টা বিবেচনা করত সে, যদি ওরা মিথ্যে না বলত। বিশেষ করে হেডম্যান। ওই ব্যাটা কিছু জানত, তাতে কোন সন্দেহ নেই লেফটেন্যান্টের। অবশ্যই জানত। লোকটার চোখ দেখেই বুঝেছে সে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও হারামজাদাকে দিয়ে সে-কথা কবুল করানো গেল না।

তাই ওদের পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তাকে। আশা ছিল আগুনের ভয়ে হয়তো মুখ খুলবে ব্যাটা, তাও হলো না। ওখান থেকে ফিরে রাতেই বেজের সাথে যোগাযোগ করেছে লেফটেন্যান্ট। নতুন নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে–যে করে হোক খুঁজে বের করো ওদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। প্রয়োজন দেখলে জানাও, আরও লোক পাঠানো হবে।

এই একটা ব্যাপারে আপত্তি আছে লেফটেন্যান্টের। লোক চেয়ে পাঠানো হলে বেজ ধরে নেবে সে ব্যর্থ হয়েছে। সে ক্ষেত্রে শুধু লোকই পাঠাবে না ওরা, সঙ্গে বড় অফিসারও পাঠাবে হয়তো।

একই কারণে সবচেয়ে কাছে যে এক গার্ড পোস্ট আছে, তার সাথেও যোগাযোগ করেনি সে। কে কখন বাঁশ দিয়ে বসবে, তার ঠিক কি? ওই ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়। যা করার নিজেই করবে, পুরো কৃতিত্ব নিজে নেবে।

আচমকা একটা সম্ভাবনার কথা খেয়াল হতে প্রায় লাফিয়ে উঠল সে। জায়ন লেক! ওদিকে যায়নি তো অজ্ঞাত শত্রু? দ্রুত হাট ছেড়ে বেরিয়ে এল সে, চেঁচিয়ে একের পর এক নির্দেশ দিতে শুরু করল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে লেকের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ল দল।

লেফটেন্যান্টের মাথায় আরও একটা চিন্তা চলছে তখন–স্লেজের চিন্তা। অজ্ঞাত দলটার সাথে দুটো স্লেজ আছে। তুষারে ওগুলোর ছাপ দেখেছে সে, পরে অবশ্য কঠিন বরফে মিলিয়ে গেছে দাগ, আর খুঁজে পায়নি। কিন্তু ওগুলো কেন?

দলটা যখন লেকে পৌঁছল, রানা-আতাসী তখন বিশ্রাম সেরে আবার উঠতে শুরু করেছে। বাঁধের গার্ড-ইন-চার্জ সার্জেন্টের সাথে কথা বলল লেফটেন্যান্ট, এঞ্জিনিয়ারদের সাথে কথা বলল, সবাই বিস্মিত হলো তার প্রশ্ন শুনে। জানাল, এখানে কোন সমস্যা নেই। সব ঠিক আছে। লেকে বোটের টহল চলছে, বাঁধে গার্ডের, কোথাও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি কারও। সব ঠিক আছে।

কিন্তু লেফটেন্যান্টের চিন্তা দূর হলো না। নিজে সব চেক করতে লাগল। সব ঠিকই আছে দেখা গেল। তবু নিশ্চিত হতে পারল না সে। এক ঘণ্টা পর নতুন নির্দেশ দিল সঙ্গীদের।

একটার দিকে অনেক কষ্টে জায়গামত পৌঁছল রানা ও আতাসী, মিনিট দশেক বিশ্রাম নিয়ে বাকি কাজে লেগে পড়ল। প্রায় এক ঘণ্টা লাগল পিটনের সাহায্যে জায়গামত ঝুলিয়ে অয়েস্টার সেট করতে। ঠাণ্ডা আরও বেড়ে গেছে এরমধ্যে, মেঘের দ্রুত

আনাগোনাও।

ফাইন্যাল চেকিং সেরে নিল রানা, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'চলো এবার।'

নামতে শুরু করল ওরা।

একই সময় সদলবলে লেকের অন্য তীরে পৌঁছল লেফটেন্যান্ট। বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে বাঁধের দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে এ-মাথা ও-মাথা নজর বুলিয়ে নিল। না, পাখি আর বাতাসে দোদুল্যমান ঘাস, শন ইত্যাদি ছাড়া কিছু নেই।

কেউ নেই।

একদম শান্ত, নিরিবিলি।

এখানে কোন অস্বাভাবিকতা নেই, সব ঠিকই আছে দেখতে পাচ্ছে অফিসার, কিন্তু তবু কেন জানি মন খুঁত খুঁত করছে। আবার বিনকিউলার চোখে লাগাল, মেইরনের বেজের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ নজর বোলাল, তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে উঠে যেতে লাগল দৃষ্টি। থুতনি পর্যন্ত উঠল।

একটা ঈগল উড়ে গেল। বরফমোড়া ঢালু একটা কাঁধ দেখা দিল। দৃষ্টি উঠে যাচ্ছে...আরেকটা ঈগল, না দুটো...ভুরু কুঁচকে উঠল লেফটেন্যান্টের—ঈগল! আরেকবার দেখি তো! গ্লাস নামাল, মানুষের মূর্তিটার নাকের গোড়ায় ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল।

কিছু একটা এইমাত্র নড়েছে ওখানটায়। চোখ যা-ই বলুক, লেফটেন্যান্টের সতর্ক মন বলছে অন্য কিছু—ঈগল নয়, কোন পাখি নয়, আর কিছু। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে মন। দুটো মানুষ! চোখ কুঁচকে ঝাড়া এক মিনিট সেদিকে চেয়ে থাকল লেফটেন্যান্ট, তারপর গ্লাসটা তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, এক সার্জেন্টের হাতে

দিয়ে কিছু বলল।

এক মিনিট পর ওটা নামাল সে, অফিসারকে ফিরিয়ে দিয়ে মাথা ঝাঁকাল। জিনিসটা ক্যানভাস কেসে ভরে রাখল লেফটেন্যান্ট। মাথার মধ্যে ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে। কারা ওরা? কি করছে ওই ওপরে?

জায়ন বাঁধ গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারি ইন্সটলেশন, যাফাত প্ল্যান্টে নিয়মিত পানি সরবরাহ করা হয় এখান থেকে। ওরা যদি স্যাবোটিয়ার হয়, তাহলে পাহাড়ে কি করছে? পাহাড়ের সাথে লেকের সম্পর্ক নেই কোন। নাকি আছে? সঙ্গীদের দেখল সে এক এক করে, সব হাবার মত দাঁড়িয়ে আছে। না, হাবা নয়, ভেড়ার মত। কাল রাতে তিলাতে যেগুলোকে ওরা পুড়িয়ে মেরেছে, ঠিক সেগুলোর মত চাউনি।

পাহাড়ে ক্লাইম্বারের উপস্থিতির কথা এই মুহূর্তে ড্যামের গার্ড কমান্ডারকে জানানো গেলে ভাল হত, কিন্তু তাতে দেরি হয়ে যাবে, ভাবল সে। তারচেয়ে বরং ওই ব্যাটাদের ইন্টারসেপ্ট করাই এ মুহূর্তে জরুরী। ওরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, আগে সেই ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। তারপর অন্য কথা।

নতুন নির্দেশ দিল সে। লেক ছেড়ে ইনল্যান্ডের দিকে ছুটল পার্টি।

শেষ বিকেলের দিকে নিচে পৌঁছে অপেক্ষমাণ সঙ্গীদের সাথে যোগ দিল রানা ও আতাসী। আঁধার আরও আগেই ঘনিয়েছে, বাতাস আগের মতই। তার সঙ্গে একটু আগে যোগ দিয়েছে তুষার, হাঁসের পালকের মত নরম তুষার পড়ছে কাত হয়ে।

'কোনও মেসেজ?' জুবায়েরের উদ্দেশে ভুরু নাচাল রানা।

'না, মেজর।'

'ওকে, এবার আমরা ফিরব,' ঘোষণা করল ও। বিনকিউলার চোখে লাগাল রওনা হওয়ার আগে চারদিকে নজর বুলিয়ে নেয়ার জন্যে। নিচের উঁচু-নিচু উপত্যকার উত্তর প্রান্তে হোঁচট খেল দৃষ্টি–কিছু একটা ধরা পড়েছে চোখের কোণে। গ্লাস ঘোরাল রানা, পরমুহূর্তে মাঝারিগোছের একটা লাফ দিল হৃৎপিণ্ড। ওটা একটা কলাম, অনেক দূরে বলে খুদে পোকার মত দেখাচ্ছে আকৃতিগুলোকে। তবে ওরা মানুষ, পোকা নয়। এক লাইনে ছুটে আসছে। গুনে দেখল ও, আটজন।

'আসছে ওরা,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

চমকে গেল সবাই। আতাসী প্রশ্ন করল, 'ইসরাইলী সার্চ পার্টি?'

'নয়তো আর কে?' আবার তাকাল ও, সামনের লোকটার ওপর নজর দিল। তার কুইল্টেড জ্যাকেটে একটা ইনসিগনিয়া দেখতে পেল। থেমে পড়ল দলটা। সামনের জনের এক হাত উপরে উঠল–বিনকিউলার ধরা আছে সে হাতে।

সামনে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট। মেইরনের হাঁটুর কাছে কয়েকটা মানুষের কাঠামো, তার মানে দলে আরও ছিল! গুনে দেখল সে, পাঁচজন। ওদের মধ্যে একজন বিনকিউলার চোখে তুলে এদিকেই তাকিয়ে আছে। মনে মনে যে দুই স্লেজ খুঁজছিল সে, ওদের পায়ের কাছে দেখা যাচ্ছে সেগুলোকে।

বিনকিউলার নামাল অফিসার, দুশ্চিন্তায় চেহারা কালো। বুঝতে পেরেছে লক্ষণ সুবিধের নয়, ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

ওদিকে রানাও দূরবীন নামাল। এক মুহূর্তের জন্যে শত্রুর সাথে ওর চোখাচোখি হয়েছে, দু'জনই দু'জনকে মেপে নিয়েছে ওরা। বুদ্ধিটাও তখনই মাথায় এল। চট্ করে ঘড়ি দেখল রানা,

সন্ধে জেঁকে বসতে আর আধঘণ্টা বাকি। 'এবার যেতে হয়।'

'কিন্তু কি করে?' মসউদ বলল। 'নামলেই তো ধরা পড়ে যাব।'

'আমরা নামছি কে বলেছে তোমাকে?' হাসিমুখে প্রশ্ন করল রানা।

সবাই বিস্মিত হয়ে তাকাল ওর দিকে। আতাসী বলল, 'নামছি না, তার মানে?'

'তার মানে যা বলেছি তাই, এখন উঠব আমরা, নামব না,' গম্ভীর গলায় বলল ও।

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল বেদুইন। 'বুঝলাম না, বস্। তাতে কি লাভ?'

'সামনের ওই যে রিজটা দেখছ,' হাত তুলে দেখাল রানা। 'ওরা ওটার আড়ালে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জায়গা ছাড়ব আমরা, ওখানে গিয়ে ওই বোল্ডারের আড়ালে অপেক্ষা করব,' একশো গজ দূরের প্রায় একই সমতলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড এক বোল্ডার দেখাল ও। 'রিজের আড়াল থেকে বের হতে সময় লাগবে ওদের, আশা করি এরইমধ্যে জায়গা মত পৌঁছে যাব আমরা।'

'কিন্তু তারপর?'

'অপেক্ষা করো।'

হিসেবে কোন ভুল হওয়ার চান্স আছে কি না ভাল করে খতিয়ে দেখল রানা। অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছল, নেই। ঠিকই আছে। ওর ধারণা ইসরাইলীদের সঙ্গে ক্লাইম্বিং গিয়ার নেই। থাকার কথাও নয়। ওদের খুঁজতে খুঁজতে যে মেইরনে আসতে হবে, তা নিশ্চই জানত না ওরা। অতএব নেই। তারওপর রাত হয়ে এসেছে, কাজেই পাহাড়ের গোড়ায় অপেক্ষা করবে সে দল নিয়ে, দিন হওয়ার অপেক্ষায় থাকবে।

তারপর ধীরেসুস্থে উঠে আসার চেষ্টা করবে, নয়তো স্রেফ বসে থাকবে খিদে-তেষ্টায় কাহিল হয়ে শত্রু নিজে থেকে ধরা দেবে, সেই আশায়। রানার অনুমান, দলের নেতা ভালই চেনে মেইরন, স্লেজ নিয়ে যেখানে এখন আছে ওরা, সে পর্যন্ত ওঠানামার পথ যে একটাই, তা তার অজানা নেই। কাজেই নড়বে না সে। গ্যাঁট হয়ে গোড়ায় বসে থাকবে। রানাও তাই চায়।

দলটা রিজের আড়ালে চলে যেতেই তৎপর হয়ে উঠল ওরা, স্লেজ টেনে নিয়ে বোল্ডারের আড়ালে চলে এল। খোলা জায়গায় এসে ওদের আগের জায়গায় দেখতে না পেয়ে মনে মনে কঠিন হাসি হাসল লেফটেন্যান্ট। সে জানে ব্যাটারা এখন কোথায় আছে। ইচ্ছে করলে ওপরে গিয়ে ওদের ব্যবস্থা সে করতে পারে, কিন্তু বাজে আবহাওয়া আর অন্ধকারে সে চেষ্টা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, তাই অপেক্ষা করবে সে।

শত্রুর কাছে কি ধরনের অস্ত্র আছে কে জানে! তাছাড়া ঝুঁকি নেয়ার দরকারটাই বা কি তার?

তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিল লেফটেন্যান্ট। ঢালু পথটার দু'পাশে চারটে তাঁবু খাটিয়ে রাস্তা সীল করে দিল সে। থাকো এবার ওপরে বসে, অজ্ঞাত শত্রুর উদ্দেশে মনে মনে বলল, ভোর হোক, তারপর হবে মোলাকাত।

তুষারপাতের পরিমাণ আরও বেড়ে যাওয়ায় খুশি হয়ে উঠল মাসুদ রানা। ঘন হয়ে পড়ছে, দশ হাত দূরের কিছুও ঠিকমত দেখা যায় না এখন। তাঁবু খাটাবার নির্দেশ দিল ও।

'এখনও সময় আছে,' খানিক ইতস্তত করে ক্যাপ্টেন আব্বাস বলল। 'হয়তো চেষ্টা করলে...' রানাকে ঘুরে তাকাতে দেখে থেমে গেল।

ওদের দেখল রানা। ভীষণরকম ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। চোখ বসে গেছে গর্তে, গাল তুবড়ে গেছে। দাড়ি গিজগিজ করছে সারা গালে। কাজ শেষ হয়েছে, অতএব এখন আর এক মুহূর্তও দেরি করতে চায় না কেউ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে পারলে বাঁচে।

'ঘাবড়িয়ো না,' নরম গলায় বলল রানা। 'প্রাণের মায়া তোমাদের চেয়ে কম নয় আমার। আমি জানি আমি কি করছি। এদিকের চিন্তা বাদ দিয়ে যা বলছি করো, ডিনারের ব্যবস্থা করো।'

ব্যাকপ্যাক থেকে নাইটগ্লাস বের করে পিছনদিকে চলল ও, আরও ওপরে উঠতে চায়। ইসরাইলীদের অবস্থানের ধরন দেখার ইচ্ছে। কিন্তু যে হারে তুষার পড়ছে, তাতে ইচ্ছে পূরণ হবে কি না, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হলো ওকে। রাতের খাওয়া সেরে নিল ওরা একজনকে গার্ডে রেখে। চা খেল।

সব কাজ চলছে নীরবে। কথা বলার মত এনার্জি নেই কারও, আগ্রহও নেই। রাত বেড়ে চলল। একসময় বাতাসের বেগ ও তুষারপাতের পরিমাণ একটু কমেছে মনে হতে বেরিয়ে এল রানা, আতাসীও এল পিছন পিছন। যতটা সম্ভব উঠে ওদের যাওয়ার একমাত্র ঢালের দিকে নজর দিল রানা। পরিষ্কার নয়, তবে দেখা গেল।

সাদা তুষারের ওপর কয়েক ছোপ রঙের আভাস দেখল ও, মনে হলো কমল্যর খোসা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। নাইটগ্লাসের কারণে লালচে দেখাচ্ছে। চারটে কমলার খোসা, ঢালের মুখ থেকে কয়েক গজ দূরে, দুদিকে দুটো করে। পিরামিড টেন্ট ওগুলো, দু'জন থাকতে পারে একেকটায়। ওগুলোর সামনে লালচে মানুষের কাঠামো হাঁটাহাঁটি করছে। পা ঠুকে শরীর গরম রাখার চেষ্টা করছে গার্ডরা।

ডানদিকের প্রথম টেন্টের ফ্ল্যাপের ফাঁক দিয়ে কিছু একটা বেরিয়ে আছে দেখল ও, সরু লাঠির মত। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল রানা। কি ওটা? চিনতে একটু সময় লাগল—ওটা একটা লাইট মেশিন-গানের নল। ওদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে পাতা হয়েছে।

ঢালের সরু দেহ বেয়ে ওপরে উঠে এল ওর দৃষ্টি। এঁকেবেঁকে সাপের মত নেমে গেছে ওটা, বা উঠে এসেছে। দু'দিকে কালো পাথরের ভেজা গা। নরম তুষার পুরু হয়ে জমে আছে পথে, অগভীর অবশ্য। তুষারপাত বাড়ছে-কমছে, এই স্পষ্ট হয়ে উঠছে সব, পরক্ষণে ঝাপসা।

শত্রুর লাইট মেশিন-গানের ব্যারেলটা দেখল ও আবার। তারপর ঢাল। কম করেও তিনশো গজ লম্বা পথটা, খাড়া।

'এত কি দেখছ, মেজর?' অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল আতাসী।

জবাবে গ্লাসটা ওর হাতে তুলে দিল রানা। 'তুমিও দেখো।' বেদুইন ওটা চোখে লাগাতে বলল, 'তাঁবুগুলো দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'মেশিন-গান?'

'হ্যাঁ।'

'এবার ঢালটা দেখো।'

'লেন্সের তুষার মুছে তাকাল লেফটেন্যান্ট। ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেল দৃষ্টি, একটুপর ফিরে এলো।

'দেখলে?' প্রশ্ন করল রানা।

'হুঁম!'

'কি বুঝলে?'

'আরও একটু পিছিয়ে যেতে পারি আমরা,' ভেবেচিন্তে মুখ খুলল সে। 'তাহলে ওদের টার্গেট করা সহজ হবে, গুলি করে…'

রানাকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল। 'না?'

'না। তাতে অর্ধেক হয়তো মরবে, অন্যেরা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নেবে। বিপদ ডবল হয়ে দেখা দেবে। আবার দেখো।'

দেখল সে, প্রায় পাঁচ মিনিট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর হাসি ফুটল তার মুখে। 'এইবার বুঝলাম, বস্। ইয়াল্লা! শালাদের...'

আজও সূর্য ওঠার দু'ঘণ্টা আগে উঠল ওরা। বাইরে ঘন অন্ধকার, বাতাস হুঙ্কার ছেড়ে আছড়ে পড়ছে মেইরনের ওপর। তুষারপাত বন্ধ আপাতত। প্রস্তুতি সেরে স্লেজ খালি করে ফেলল ওরা, সব তাঁবুর ভেতর রাখল। এরপর বাছাই করা বড় বড় পাথর তোলা হলো স্লেজে, অর্ধেক ভরে ফেলা হলো।

'ইয়াল্লা!' কাজের ফাঁকে আতাসী বলল বিড়বিড় করে। 'এগুলো এক্সপ্রেস ট্রেনের মত গিয়ে পড়বে ব্যাটাদের ওপর।'

সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, খানিক পর পর পুব আকাশের দিকে তাকাচ্ছে রানা। পিছনে রেঞ্জের কিনারা আকাশের গায়ে একটু একটু ফুটতে শুরু করেছে দেখে আতাসীকে ওপরে পাঠাল রানা নিচের ক্যাম্পের পরিস্থিতি বুঝে আসতে। অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এল সে।

'কোন সাড়া নেই, মেজর। সব শালা বেহুঁশ।'

'ওকে, জলদি রেডি হও সবাই,' নির্দেশ দিল ও। তারপর স্লেজে উঠে বসল, পাথরের আড়ালে। হাতে আর্মালাইট রেডি।

অন্যরা যে যার স্কি পরে পোল স্লেজে তুলে রাখল, অবস্থান নিল ওটার পিছনে।

'ফ্যান আউটের কথা মনে রেখো,' বলল রানা। 'সবাই সবার ফিল্ড অভ ফায়ার থেকে দূরে থাকবে।'

আকাশ দেখল ও, সামনে তাকিয়ে ঢাল দেখল। একটু একটু

করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে পথ। সাদা রঙের দীর্ঘ একটা সাপ যেন। আরও কিছুটা আলো ফোটার জন্যে অপেক্ষা করল ও, তারপর নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসল। 'রেডি?'

আতাসী জবাব দিল, 'রেডি।'

'লেট'স গো!'

দুলে উঠল স্লেজ, পরমুহূর্তে লাফ দিল।

ছুটল ঝড়ের গতিতে, হেলেদুলে, এঁকেবেঁকে। প্রতিবার বাঁক নেয়ার সময় দেয়াল ঘেঁষে কাত হয়ে। কয়েকটা বাঁকে গতির তোড়ে উল্টে পড়ার অবস্থা হলেও শেষ পর্যন্ত পাথরের ওজন বাঁচিয়ে দিল। আঁধার চিরে ছুটছে স্লেজ, ওপরে আর্মালাইট বাগিয়ে বসে আছে রানা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার আগুনে নাক-মুখ পুড়ে যাচ্ছে। চোখ মেলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে ভীষণ, চোখের দুই প্রান্তে পানি জমে শিরশির করছে।

স্লেজের দুই পাশে রয়েছে আতাসী ও আব্বাস, পিছনে মসউদ ও জুবায়ের। স্লেজ ধরে রেখেছে এক হাতে, অন্য হাতে আর্মালাইট রেডি। শেষ বাঁক ঘুরে টেন্টমুখো হলো স্লেজ, ঠিক সেই মুহূর্তে গর্জে উঠল নিচের লাইট মেশিনগান। কিন্তু সে মাত্র অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্যে, অনেকটা কথা বলার আগে গলা খাঁকারি দেয়ার মত।

সময় হতে স্লেজ থেকে লাফিয়ে পড়েই গড়াতে শুরু করল রানা, তুফান বেগে অ্যামবুশ টেন্টের দিকে ছুটে গেল ওটা। ওরা চারজন স্লেজ ছেড়ে দিয়েছে আগেই, বসে স্কি করে নামছে, বিরতিহীন হুঙ্কার ছাড়ছে চারটে আর্মালাইট।

বৈদ্যুতিক ট্রেনের গতিতে অ্যামবুশ টেন্টের ওপর উঠে পড়ল স্লেজ, ভাঙাচোরার ধাতব শব্দ ও কয়েকটা কণ্ঠের মরণ চিৎকার উঠল। সব বাধা মাটিতে পিষে দিয়ে ওপাশে চলে গেল স্লেজ।

এক ধাক্কায় এপাশের দুটো টেন্টই খতম হয়ে গেল ভেতরের চার ইসরাইলী সৈন্যসহ। বাকি সব গেল ওদের পাঁচজনের সম্মিলিত গুলি বর্ষণের ফলে।

গোটা ব্যাপারটা এত সহজে মিটে গেল যে রানা পর্যন্ত বিস্মিত না হয়ে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া, দলামোচড়া হয়ে থাকা হলুদ টেন্টগুলো দেখল ও। তলায় অল্প অল্প নড়াচড়া দেখে গুলি করে থামিয়ে দিল। গভীর নীরবতা নেমে এল চারপাশে।

নিজে ওখানকার পাহারায় থেকে সঙ্গীদের ওপরে পাঠিয়ে দিল ও জিনিসপত্র নামিয়ে আনতে। এরমধ্যে তুষার পড়া থেমে গেছে, মেঘ কেটে আকাশও পরিষ্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে একটু একটু।

আধ ঘণ্টার মধ্যে নিজেদের তাঁবু খাটাল ওরা ইসরাইলীদের টেন্টের ধ্বংসস্তূপ থেকে সামান্য দূরে। ধীরেসুস্থে নাস্তা খেয়ে গরম চায়ের কাপ নিয়ে বসল। কোন তাড়া নেই।

চারদিক বেশ ফরসা হতে উঠে পড়ল রানা। সবাই মিলে টেন্ট থেকে দুমড়ানো-মোচড়ানো, রক্তাক্ত আটটা লাশ বের করে পাশাপাশি শুইয়ে রাখল। জয়ের আনন্দ, উত্তেজনা নেই এখন, প্রত্যেকে গম্ভীর।

'এ মৃত্যু ওদের পাওনা ছিল,' নিচু গলায় বলল রানা।

আব্বাস মাথা দোলাল।

লেফটেন্যান্টকে দেখল রানা, হাঁ হয়ে আছে লোকটা, চোখ খোলা। বুঝতে পারল একেই দেখেছে ও বিনকিউলার হাতে। সরু গোঁফ আছে তার, অল্পবয়সী। হালকা-পাতলা, মজবুত গড়ন।

'শালার চেহারাই আস্ত হারামজাদা মার্কা,' আতাসী মন্তব্য করল। 'কিন্তু কান দুটো ভারি সুন্দর, ইয়েলো কোরালের মত। ট্রফি হিসেবে কেটে নিয়ে যাব নাকি?'

হতাশ চেহারা করে ওদের কাছে ফিরে এল জুবায়ের। 'ব্যাটাদের সঙ্গে সাপ্লাই তেমন নেই।'

কেউ জবাব দিল না।

অনেকক্ষণ পর নড়ে উঠল মাসুদ রানা। 'এইবার ফেরা যাক।'

দশ

মেতুলা। কমিউনিকেশনস্ রুমের আধো-আলো আধো-ছায়ায় সেদিনের চারজন বসা। ক্লান্ত নজর স্যাটেলাইট স্ক্রীনের ওপর। আটদিন হয়ে গেল কেবল মেসেজ প্রিন্ট করেই চলেছে ওগুলো, মিশন ডুমসডের কোন খবর' নেই। ওরা আছে না মরে গেছে, কিছুই জানা যায়নি। প্রত্যেকে হতাশ, ওদের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।

প্রতিদিন অন্তত বিশ ঘণ্টা করে পর্দায় নজর সেঁটে থাকে সবার, কান খাড়া হয়ে থাকে ট্রান্সিভারের খড়মড় শোনার আশায়, কিন্তু সব বৃথা। অপেক্ষা করতে করতে ভীষণরকম ক্লান্ত, অবসন্ন প্রত্যেকে। মিশন ব্যর্থ হয়েছে ধরে নেয়া গেলে যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হত, তাও পারা যাচ্ছে না জেনারেল আরাবীর জন্যে। এখনও ভদ্রলোকের এক কথা, মাসুদ রানা যখন নেতৃত্বে আছে, তখন ব্যর্থতার প্রশ্নই আসে না। তার সাথে রেডিও মেসেজের ব্যাপারটাও আছে। ওরা যদি ধরা পড়েই থাকে, বা আর কোন দুর্ঘটনায় পড়ে থাকে, তাহলে মেসেজ পাঠাচ্ছে না কেন?

ন'টার দিকে কর্নেলের নির্দেশে চায়ের কথা বলার জন্যে উঠতে যাচ্ছিল ক্যাপ্টেন আরিফ, ঠিক তখনই চেহারা বদলে গেল স্ক্রীনের। মুহূর্তের জন্যে কালো হলো, পরমুহূর্তে খুদে একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল এক প্রান্তে। মুহূর্তখানেক পর ওটার নিচে ঝড়ের বেগে মেসেজ প্রিন্ট হতে শুরু করল।

প্রথমে কিছুক্ষণ থতমত খেয়ে বসে থাকল সবাই, পরক্ষণে নিজ নিজ পদমর্যাদা ভুলে গেল বেমালুম।

মেইরন থেকে মাইলখানেক সরে এসে সবাইকে থামার নির্দেশ দিল রানা। কুইল্টেড জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে একটা গানমেটাল বক্স বের করল। দামী কলমের বাক্সের মত দেখতে ওটা। ওপরের দিকে ছোট একটা ডায়াল আছে। নিচের অংশে আছে একটা লাল সুইচ। কনসিল্ড্ চেম্বারে। পাশের একটা লিভার টিপলে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ঢাকনা।

ভয় মাখানো বিস্ময় আর অবিশ্বাস নিয়ে ওর হাতের দিকে তাকিয়ে থাকল আতাসী, আব্বাস, মসউদ ও জুবায়ের। ঢোক গিলছে। মোর্স সঙ্কেত পাঠানো শেষ করল রানা, লিভার চেপে সুইচের চেম্বার ওপেন করে সঙ্গীদের উদ্দেশে ম্লান হাসি হাসল।

'এবার দেখা যাক ফল কি দাঁড়ায়,' বলল ও। নিচের দিকে টেনে অন করল সুইচ, টাম্বলিঙের মৃদু 'টুক' আওয়াজটা সবার কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সব ক'টা মুখ ঘুরে গেল মেইরনের দিকে।

পরমুহূর্তে অত্যুজ্জ্বল, ভয়াবহ সাদা আলোর ঝলকে অন্ধ হয়ে গেল ওরা। বিস্ফোরণের আওয়াজ এল একটু পর, শক্ ওয়েভের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল সবাই, নিজেদের হারিয়ে ফেলল অসহ্য আলো আর বিকট আওয়াজের সমুদ্রে। যেন আচমকা আরেকটা সূর্য জ্বলে উঠেছে মাথার ওপর, ক্রমে বড় হচ্ছে ওটা, মাটি কাঁপছে,

বিকট চড়চড় শব্দে ফাটল ধরছে বরফে, মাকড়সার জালের মত কিল্‌বিল্‌ করতে করতে ছুটছে চতুর্দিকে।

ফুসফুস খালি হয়ে গেল ওদের, পরমুহূর্তে গরম বাতাসে ভরে উঠল, আবার খালি হলো। ওদিকে সূর্যটা রঙ বদলে কমলা রঙ ধরেছে, ফুলের মত দ্রুত পাপড়ি মেলছে। আওয়াজ বাড়ছে। ধাক্কা সামলে কোনমতে উঠে বসল ওরা, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দৃশ্যটা বদলে গেল, কালো বৃষ্টির তোড়ে কমলা রঙের ফুলটা স্তিমিত হয়ে গেল।

আলো আরেকটু কমতে মেইরনের হাসিমাখা মুখটা দেখতে পেল রানা, এখনও পুরো আস্ত, ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকে আসছে। ওপরের বরফ ফুটছে টগবগ করে। আরও ঝুঁকল ওটা, তারপর হঠাৎ করে অবলম্বন হারিয়ে ঝাঁপ দিল। দলের কেউ একজন গুঙিয়ে উঠল।

অদৃশ্য হয়ে গেল মাথাটা। তার একটু পর অন্য রকম একটা আওয়াজ শুনতে পেল সবাই। আরও গভীর। প্রচুর বাষ্প উঠছে দেখে বোঝা গেল জায়ন লেক ফুটতে শুরু করেছে অসহ্য তাপে। তারপর লাফ দিল পানি, গোটা লেক। নীল নয়, আগুনের প্রতিফলনের ফলে লাল দেখাচ্ছে। দেখতে দেখতে অনেক উঁচুতে উঠে গেল সাগরের প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মত, একটু যেন বিরতি দিল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঁধের গায়ে।

যেন ম্যাচের কাঠি, ভেঙে গেল ওটা, উড়ে গেল। তারপর, গিরিখাত ধরে বজ্রপাতের মত টানা আওয়াজের সাথে যাফাতের দিকে ছুটে চলল জায়ন লেক।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মিশন ডুমসডের পাঁচ সদস্য, এখন আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কেবল পানির ভয়াবহ হুঙ্কার শুনতে পাচ্ছে।

বিবিসি প্রথম প্রচার করল খবরটা। ওই দিন সন্ধের খবরে নিজস্ব সংবাদদাতার বরাত দিয়ে যা জানাল, তা এরকম: আজ সকালে সিরিয়া ইসরাইল সীমান্তবর্তী এলাকার ইসরাইল অংশের এক পাহাড়ের মাথা নিচের বাঁধের ওপর ধসে পড়ায় বাঁধটা ধ্বংস হয়ে গেছে, এবং বাঁধের মিলিয়ন মিলিয়ন টন পানি এক গিরিখাতের ভেতর দিয়ে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ছুটে গিয়ে সে দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে।

ইসরাইলের বেসরকারী সূত্রগুলো জানাচ্ছে এই দুর্ঘটনায় কম করেও দশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান ব্যাপারটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফল। জেরুজালেম এ ব্যাপারে এখনও কোন প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

তৃতীয় দিন সকালে ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করল মিশন ডুমসডে। প্রথম হাটে যখন পৌঁছল, তখন প্রায় সন্ধে। সেদিন এখানেই ওদের নামিয়ে দিয়েছিল পিউমা। হাটে ঢুকেই কাবার্ডটা খুলল মাসুদ রানা, ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ভেতরে। যেখানে জনি ওয়াকারের বোতল দুটো ছিল, সেখানটা ফাঁকা। একটাও নেই।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে জর্ডানিয়ান মসউদের দিকে ফিরল, গম্ভীর গলায় বলল, 'সেদিন হাট ছাড়ার সময় আমার সঙ্গে তুমি আর মাহের ছিলে ভেতরে। তোমাদের কেউ চুরি করেছ ওগুলো, কে সে?'

মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল যুবক।

'নিশ্চই তুমি! তুমি ছাড়া...'

'কিন্তু আমি তো ওটার কাছেও যাইনি,' আপত্তির সুরে বলল সে।

তখনই ব্যাপারটা খেয়াল হলো রানার, সেদিন এখানে রাত কাটিয়ে যাওয়া নিয়ে কথা বলার সময় কাবার্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সাদিক মাহের। তার মানে কাজটা ওরই।

কিছুক্ষণ নীরবে মসউদকে পর্যবেক্ষণ করল ও, ক্লান্ত গলায় প্রশ্ন করল, 'তুমি জানতে?'

'না।'

অনড় দাঁড়িয়ে থাকল রানা। অন্যমনস্ক। মাহেরের কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছে। মদের নেশা যদি দমন করতে পারত, যদি একটু সহিষ্ণু আর ধৈর্যশীল হত, আজ তাহলে সে-ও থাকত ওদের সাথে।

জুবায়েরের দিকে ফিরল ও। 'বেজে মেসেজ পাঠাও।'

আধঘণ্টা পর পৌঁছল সেদিনের সেই পিউমা, ওদের নিয়ে প্রায় তখনই উড়াল দিল আকাশে।

আতাসী এসে বসল রানার পাশে। বলল, 'এবার কোনদিকে, মেজর? দেশে ফিরবে?'

হেলান দিয়ে চোখ বুজল ও। 'হ্যাঁ, প্রিয় জন্মভূমি···আমার মায়ের কোলে।'

'আমার সঙ্গে চলো, বস্। কয়েকদিন থেকে আসবে আমাদের সাথে। আমি, মার্সিয়া—খুব খুশি হব।'

একটু ভাবল রানা, মাথা ঝাঁকাল। 'আমি জানি। দেখি, প্রিয় বুড়ো যদি ছুটি দেয়।'

অস্তগামী সূর্যের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকল দু'জন। গোটা আকাশে সিঁদুরে মেঘের আলপনা এঁকে ডুবে যাচ্ছে ওটা।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

অগ্নিবাণ

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানার প্রতিশোধ কী ভয়াবহ হতে পারে,
এটা তারই কাহিনী। মধ্যপ্রাচ্যে বিসিআই-এর একজন
ভ্রাম্যমাণ এজেন্ট নিখোঁজ। এডেনে রানা এজেন্সির দু'জন
অপারেটর খুন। এরপর আর বসে থাকা যায় না।
রানা সিদ্ধান্ত নিল ইসরায়েলের ন্যাভাল বেস সোকোট্রা দ্বীপ
উড়িয়ে দেবে। সাহায্যের বিনিময়ে উপকার চাইলেন
লিবিয়ান ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার ফারাজি–
নতুন গাইডেন্স সিস্টেমসহ একটা মিসাইল চাই তাঁর।
কোথাও একটা ফাঁদ আছে জেনেও রাজি হয়ে গেল রানা,
মার্সেনারিদের একটা দল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল
শত্রুপক্ষের একটা জাহাজ হাইজ্যাক করতে।
শুরু হলো রুদ্ধশ্বাস অভিযান।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

কা. আ. হোসেন।

বায়রন

শেখেরটেক, মোহম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

এখন রাত সাড়ে তিনটা। রাত দেড়টার দিকে বইটা নিয়ে বসেছিলাম, এইমাত্র শেষ হলো। দুঃখ হচ্ছে, আরও পঁচিশ বছর আগে কেন জন্মালাম না। তাহলে এতদিন এই রকম ভাল একটা বই পড়া থেকে বিরত থাকতাম না। কাজীদা, প্রশংসা করে আপনাকে ছোট করব না, শুধু এইটুকুই বলব যে, শারীরিক ভালবাসা নয়, প্রেম যে কত মহান ও পবিত্র তা আপনি প্রমাণ করে দিয়েছেন। নবীন (বয়স ১৭) পাঠক হলেও রানার প্রায় ১২০টা বই পড়ে ফেলেছি। 'বিস্মরণ' পড়ার আগে ধারণা ছিল 'অগ্নিপুরুষ',

'আই লাভ ইউ, ম্যান' ও 'রক্তের রঙ'ই বুঝি রানার শ্রেষ্ঠ বই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমার ধারণা ভুল ছিল।

মাসুদ রানা পড়ার আগে মাঝেমধ্যে কষ্ট হতো আমার কোন বড় ভাই নেই বলে। কিন্তু এখন আমি তাঁর মাঝেই খুঁজে নিয়েছি নিজের আদর্শ বড় ভাই।

দোয়া করবেন যেন রানা ভাইয়ের মতই বিশাল হৃদয় নিয়ে বেড়ে উঠতে পারি।

* দোয়া করি, অনেক বড় হও।

তানভীর আহমদ

নূরানী সড়ক, বত্রিশ, কিশোরগঞ্জ।

এইমাত্র আপনার 'কর্কটের বিষ'শেষ করলাম। কিন্তু বইটিতে রানাকে তার স্বরূপে দেখতে পেলাম না। রানার কি বয়স বেড়ে যাচ্ছে? 'পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয় আর মৃত্যুর হাতছানি' – কিন্তু এই বইটিতে তা কোথাও দেখতে পেলাম না। আসলে আপনি মামুনের চরিত্রটিকে প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছেন বেশি। ফলে মাসুদ রানা সাইড নায়কে পরিণত হয়েছে। আশা করি ভবিষ্যতে রানাকে স্বরূপে দেখতে পাব।

আমার একটি প্রশ্নের জবাব দেবেন কি?

বইটির ২৪ পৃষ্ঠায়–

সংখ্যায় ছিল ৬জন, দুইজন পালিয়েছে, দুইজন গণপিটুনিতে মারা গেছে, একজন পালাতে না পেরে বিল্ডিঙের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেছে।

তাহলে আরেকজন কোথায় গেল?

* কি জানি! ৫ম জন কোথায় যায় দেখে যখন আবার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছি, দেখি গায়েব!

সুমী ভৌমিক

নগর খানপুর, নারায়ণগঞ্জ।

রানার 'দংশন' ও 'কর্কটের বিষ' দুটি বই একসাথে পেয়ে পড়লাম। 'দংশন' বইটি না পড়লে বুঝতেই পারতাম না অল্প কিছুদিনের বন্ধুত্বও এত মধুর হতে পারে। বইটি পড়ে সত্যিই আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু বইটির শেষদিকে এসে আপনি যেভাবে চার্লিকে মেরে ফেললেন, আপনাকে সেজন্য একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনী ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছি না আমি। আশ্চর্য, আপনি কিভাবে এতটা নিষ্ঠুর হলেন! এক বন্ধুর সামনে আরেক বন্ধুকে মেরে ফেলতে পারলেন? রানা যখন চার্লির মৃত্যু দেখে কাঁদছিল আমার মনে হচ্ছিল আমিই যেন চার্লির মৃত্যু দেখছি। রানা কি কাঁদবে ওর মৃত্যু দেখে, আমিই তো কেঁদে অস্থির!

'কর্কটের বিষ' বইটিও অপূর্ব লেগেছে। মামুনের মৃত্যুটাও কম বেদনাদায়ক হয়নি। সত্যি বলতে কি রানার পর একমাত্র মামুনকেই আমার অসম্ভব ভাল লেগেছিল। ওকে না মারলে কি চলতো না? ওর মৃত্যু আমাকে কতখানি কষ্ট দিয়েছে তা বলে বোঝাতে পারব না। তবে দুটো বই-ই চমৎকার। এরকম বন্ধুত্ব নিয়ে আরও বই চাই। তবে দয়া করে বন্ধুটিকে মেরে ফেলবেন না।

* চার্লির ব্যাপারটা মেনে নিচ্ছি, ওকে মেরে ফেলাটা হয়তো আমার অন্যায়ই হয়েছে; কিন্তু কেউ আত্মহত্যা করলে সেটাও কি আমার দোষ?

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০·০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২১-১১-'০০ পটল ভাইয়ের পনৌপ্র(রম্য গল্প/প্রজা)শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া
বিষয়: মজার মজার বিভিন্ন স্বাদের মোট ১০টি গল্প নিয়ে রচিত হয়েছে এই বই। পটল ভাইয়ের আজব যত হাসির কাণ্ড তো আছেই। একবার পড়তে বসলে শেষ না করে ছাড়তে পারবে না কেউ।

২১-১১-'০০ এশিয়ার রূপকথা (রূপকথা/প্রজাপতি)কাজী মায়মুর হোসেন
বিষয়: বাংলাদেশের একটি, মায়ানমারের দু'টি, কোরিয়ার দু'টি, পারস্যের দু'টি এবং ইরাকের একটি , এই আটটি মজার মজার ভিন্ন স্বাদের রূপকথায় সমৃদ্ধ এই বই। ছোট বড় সবার কাছেই ভাল লাগবে।

আরও আসছে

২৭/১১	রহস্যপত্রিকা	(১৭ বর্ষ ২ সংখ্যা)	ডিসেম্বর, ২০০০
৪/১২	রাশিফল ২০০১	(বর্ষফল)	প্রফেসর হাওলাদার
৪/১২	অন্বেষা	(ওয়েস্টার্ন)	কাজী মায়মুর হোসেন